অধ্যায় ১১

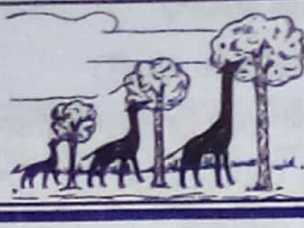

জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
Genetics & Evolution

প্রধান শব্দাবলি (Key words)	
▫ অসম্পূর্ণ প্রকটতা	▫ বিবর্তন তত্ত্ব
▫ এপিস্ট্যাসিস	▫ পুনরাবৃত্তি মতবাদ
▫ লিথাল জিন	▫ আর্কিওপটেরিক্স

বংশবিস্তারের মাধ্যমে জীবের বংশধারা অক্ষুন্ন থাকে। পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জীব তার নিজের আকৃতিবিশিষ্ট ও গুণসম্পন্ন অপত্য জীবের জন্ম দেয়, তাই কুকুরের শাবক কুকুরের মতো, গরুর শাবক গরুর মতোই হয়। একটি জনু (generation) থেকে পরবর্তী জনুগুলোতে জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে **বংশগতি** (heredity) বলে।

বংশগতির ক্রমধারার পথ পরিক্রমের সময়ে বিভিন্ন কারণে জীবদেহে কিছু আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে। কালক্রমে এ পরিবর্তনগুলো ঐ জীবের জিনগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতি। এক প্রজাতি থেকে দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত ধীর গতিতে **বিবর্তন**-এর ফলে নতুন প্রজাতির আবির্ভাব হয়। এ অধ্যায়ে জীবের বংশগতি এবং বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা–১৫ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ইনহেরিট্যান্সের ক্রোমোজোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ব্যাখ্যা করতে পরবে। ৫. লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিবর্তনের মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বর্ণনা করতে পারবে। ১১. প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।	● মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স ○ মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র ● ইনহেরিট্যান্স এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব ● মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম ○ অসম্পূর্ণ প্রকটতা ○ সমপ্রকটতা ○ লিথাল জিন ○ পরিপূরক জিন ○ এপিসটাসিস ● পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ● লিঙ্গ নির্ধারণ (XX-XY, XX-XO) নীতি ● সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার ○ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসকুলার ডিসট্রফি ● ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ○ রক্ত সঞ্চালন জটিলতা ○ গর্ভধারণজনিত জটিলতা (এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস) ● বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা ● বিবর্তনের মতবাদ ○ ল্যামার্কিজম ○ ডারউইনিজম ○ নব্য ডারউইনবাদ ● বিবর্তনের প্রমাণাদি

১১.১ : জিনতত্ত্ব (Genetics)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কাজ, বংশপরম্পরায় সঞ্চারণের ধরণ ও ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্ব** বা **জেনেটিক্স** (Genetics) বলে। **উইলিয়াম বেটসন** (William Bateson, 1861—1926) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Genetics শব্দ প্রচলন করেন। Genetics শব্দটি গ্রিক শব্দের মূল রূপ 'gen' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার প্রকৃত অর্থ হলো **পরিণতি স্বরূপ ঘটা** (to become) অথবা **কোনো কিছুতে উদ্ভূত হওয়া** (to grow into)।

জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

মানবকল্যাণে নিয়োজিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর শাখা হলো **জিনতত্ত্ব**। জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার বিশেষ কয়েকটি দিক নিম্নরূপ :

১. জিনের প্রয়োজনীয় গাঠনিক ও পরিমাণগত (পলিপ্লয়ডি) পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ও বাড়তি পুষ্টিমানসম্পন্ন উৎকৃষ্ট জাতের ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

২. জিনতত্ত্বের জ্ঞানের আলোকে সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নতজাতের গৃহপালিত পশু-পাখি উদ্ভাবন অব্যাহত আছে।

৩. ত্রুটিপূর্ণ জিন অপসারণ ও উপযুক্ত জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে মানানসই, সুস্থ, দ্রুত বর্ধনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।

৪. বংশগতির ধারা পর্যালোচনা করে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংকরায়নের মাধ্যমে মানুষসহ অন্যান্য প্রজাতির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৫. মানুষের বিভিন্ন রোগের (যেমন, ক্যান্সার) জেনেটিক কারণ উদঘাটন ও তার নিরাময় সম্পর্কে মানুষ অত্যন্ত আশাবাদী।

৬. অণুজীবের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এদের রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা রহিত করা হচ্ছে।

অপরাধী শনাক্তকরণে, পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্বের সম্পর্ক যাচাইয়ে জিনতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে।

জোহান মেন্ডেল–জিনতত্ত্বের জনক

মেন্ডেল কে ছিলেন ? জিনতত্ত্বের জনক বলে পরিচিত **গ্রেগর জোহান মেন্ডেল** (১৮২২–১৮৮৪) অস্ট্রিয়াবাসী একজন ধর্মযাজক ছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর বিভিন্ন মটরশুঁটি (Pea) গাছের উপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি বংশগতির দুটি "সূত্র" প্রবর্তন করেন। তাঁর সূত্রগুলোকে **মেন্ডেলের সূত্র** বা **মেন্ডেলিজম** বলে আখ্যায়িত করা হয়। মেন্ডেল প্রদত্ত তত্ত্ব বর্তমান জিনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

মেন্ডেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী : কৃষকের সন্তান **জোহান মেন্ডেল** (Johann Mendel)-এর জন্ম ১৮২২ সালে অস্ট্রিয়ায়। তাঁর স্বপ্ন ছিল শিক্ষক ও বিজ্ঞানী হবেন। কিন্তু দারিদ্রের কষাঘাতে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ ত্যাগ করে তিনি অস্ট্রিয়ার **ব্রুন** (Brunn) শহরে অবস্থিত গির্জায় শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেন।

১৮৫৭ সালে তিনি ৩৪ প্রকার **মটরশুঁটি** (*Pisum sativum*) সংগ্রহ করে গির্জা সংলগ্ন বাগানে উদ্ভিদের বংশগতি রহস্য উদঘাটনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। দীর্ঘ সাত বছরের কঠিন ও দুঃসাধ্য পরীক্ষা শেষে তিনি বংশগতির দুটি **সূত্র** (Law) আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষার সমস্ত কাগজপত্র **১৮৬৬ সালে ব্রুন ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি** (Natural History Society of Brunn)-তে জমা দেন। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এ পরীক্ষার গুরুত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। **১৮৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারি,** তাঁর সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠা লাভের অনেক আগেই, মেন্ডেল **মৃত্যুবরণ** করেন।

তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিন ভিন্ন দেশের তিন বিজ্ঞানী পৃথকভাবে কিন্তু একই সময়ে মেন্ডেলের গবেষণার ফলাফল পুনরাবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীরা হলেন :

ক. নেদারল্যান্ডসের উদ্ভিদবিজ্ঞানী **হিউগো ডে ভ্রিস** (Hugo de Vries, 1848–1935),

খ. জার্মানির উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক **কার্ল করেন্স** (Carl Correns, 1864–1933) এবং

গ. অস্ট্রিয়ার কৃষিবিজ্ঞানী **এরিক চেমেক** (Erich Tschermak, 1871–1962)।

আশ্চর্যের বিষয় হলো এ বিজ্ঞানীরা তাঁদের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেই মেন্ডেলের গবেষণা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এভাবে মেন্ডেলের গবেষণার মাধ্যমে বংশগতির মৌলিক সূত্রের আবিষ্কার ও প্রকাশের মাধ্যমে যে ভিত্তি রচিত হয় তার উপর নির্ভর করে জীববিজ্ঞানে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্ব** নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার বিকাশ ঘটে। এ কারণে মেন্ডেলকে **বংশগতিবিদ্যার জনক** (Father of Genetics) বলে অভিহিত করা হয়।

মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স (Mendelian Inheritance)

মেন্ডেল **বিপরীত বৈশিষ্ট্য** (alternative character)-যুক্ত দুধরনের মটরশুঁটি গাছ (*Pisum sativum*) নিয়ে তাঁর পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এক ধরনের উদ্ভিদ ছিল **লম্বা** (tall), অন্য শ্রেণির উদ্ভিদ ছিল **খাটো** (dwarf)। পরীক্ষা শুরু করার আগে তিনি মটরশুঁটি গাছের বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) একটি **লম্বা** উদ্ভিদের সঙ্গে শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত একটি **খাটো** উদ্ভিদের কৃত্রিম পরাগসংযোগ ঘটান। লম্বা উদ্ভিদের **পরাগরেণু** (pollen) নিয়ে খাটো উদ্ভিদের গর্ভমুন্ডে স্থাপন করা হলো। পরাগসংযোগের ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে যে সব উদ্ভিদ আবির্ভূত হলো তা **সবগুলোই লম্বা**। প্রথম পরাগসংযোগের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলোকে মেন্ডেল **প্রথম বংশধর** (first filial generation) বা F_1 **জনু**রূপে চিহ্নিত করেন। পরে মেন্ডেল F_1 জনুর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে সংকরায়ন (hybridization) ঘটান। দ্বিতীয়বার পরাগসংযোগের ফলে সৃষ্ট **দ্বিতীয় বংশধর** (second filial generation)-এ বা F_2 **জনুর** মোট ১০৬৪ উদ্ভিদের মধ্যে ৭৮৭টি লম্বা এবং ২৭৭টি খাটো পাওয়া গেল, অর্থাৎ লম্বা ও খাটো উদ্ভিদের অনুপাত দাঁড়ালো ৩ : ১। এভাবে মেন্ডেল মটরশুঁটিপ গাছের নির্বাচিত সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য (প্রকট ও প্রচ্ছন্ন) নিয়ে সংকরায়ন ঘটান।

মটর গাছের বৈশিষ্ট্য	লক্ষণ		দ্বিতীয় সংকর পুরুষে উৎপন্ন মোট বংশধর		মোট বংশধর
	প্রকট	প্রচ্ছন্ন	প্রকট	প্রচ্ছন্ন	
বীজের আকৃতি	মসৃণ ত্বক	কুঞ্চিত ত্বক	৫,৪৭৪	১,৮৫০	৭,৩২৪
বীজপত্রের রং	হলুদ	সবুজ	৬,০২২	২,০০১	৮,০২৩
ফুলের অবস্থান	কাক্ষিক	শীর্ষ	৬৫১	২০৭	৮৫৮
ফুলের রং	রঙিন	সাদা	৭০৫	২২৪	৯২৯
মটরশুঁটির আকৃতি	মসৃণ ও চ্যাপ্টা	খাঁজযুক্ত	৮৮২	২২৯	১,১৮১
মটরশুঁটির রং	সবুজ	হলুদ	৪২৮	১৫২	৫৮০
কাণ্ডের দৈর্ঘ্য	লম্বা	খাটো	৭৮৭	২৭৭	১,০৬৪

নিচের তালিকায় মটরগাছের উপর মেন্ডেলের সাতটি পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করা হলো।

মেন্ডেলের উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো (প্রতিক্ষেত্রে) একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছের মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং এ ধরনের পরীক্ষাকে **মনোহাইব্রিড ক্রস** (monohybrid cross) বা **একলক্ষণ সংকরায়ন** বলা হয়।

পরবর্তীতে মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত **হলুদ-গোল বীজ** উৎপন্নকারী উদ্ভিদের সাথে অপর একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত **সবুজ-কুঞ্চিত বীজ** উৎপন্নকারী উদ্ভিদের পরাগসংযোগ ঘটানোর পর দেখা গেল F_1 জনুর সবগুলো উদ্ভিদই **হলুদ-গোল বীজ** উৎপন্ন করতে সক্ষম। কিন্তু F_2 জনুতে ১৬টি বংশধরের মধ্যে ৯টি হলুদ-গোল, ৩টি হলুদ-কুঞ্চিত, ৩টি সবুজ-গোল ও ১টি সবুজ-কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদ পাওয়া গেল। মেন্ডেলের এ পরীক্ষাকে (দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সংঘটিত) **ডাইহাইব্রিড ক্রস** (dihybrid cross) বা **দ্বিলক্ষণ সংকরায়ন** বলে। মেন্ডেলের উপরোল্লিখিত গবেষণা ও ফলাফল সামগ্রিকভাবে **মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স** নামে পরিচিত।

পরীক্ষার জন্য মেন্ডেলের মটরগাছ বেছে নেয়ার কারণ

বাগানের মটরগাছে (garden pea) নিম্নলিখিত কতকগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার জন্য মটর গাছকে নমুনা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

১. মটরগাছ **একবর্ষজীবী** হওয়ায় অতি সহজেই বাগানের জমিতে এবং টবে ফলানো যায়।

২. মটরগাছের প্রতিটি জনুর **আয়ুকাল স্বল্প** হওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যেই সংকরায়ন পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়।

৩. মটরফুল **উভলিঙ্গ** হওয়ায় সহজেই স্ব-পরাগায়ন ঘটে।

৪. মটরফুল **স্ব-পরাগী** হওয়ায় বাহির থেকে আগত অন্য কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজে মিশে যেতে পারে না, ফলে বংশ পরম্পরায় নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শুদ্ধ সন্তান-সন্তুতি উৎপাদন সম্ভব।

৫. ফুলগুলো আকারে বড় হওয়ায় মটর গাছে অতি সহজেই পর-পরাগায়নও ঘটানো সম্ভব হয়।

৬. মটরগাছে সুস্পষ্ট তুলনামূলক বংশগতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়–এ জন্য মটর গাছের বহু **প্রকরণ** (varieties) বিদ্যমান।

৭. সংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বংশধরগুলো উর্বর (fertile) হয়; অর্থাৎ এরা জননক্ষম হওয়ায় নিয়মিত বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

বৈশিষ্ট্য	বিপরীত চরিত্রলক্ষণ	
	প্রকট	প্রচ্ছন্ন
১। বীজপত্রের রং	হলুদ	সবুজ
২। বীজের আকার	মসৃণ	কুঞ্চিত
৩। ফুলের রং	রঙিন	সাদা
৪। মটরশুটির রং	সবুজ	হলুদ
৫। মটরের আকার	মসৃণ ও চ্যাপ্টা	খাঁজযুক্ত
৬। ফুলের অবস্থান	কাক্ষিক	শীর্ষ
৭। কান্ডের দৈর্ঘ্য	লম্বা	খা

চিত্র ১১.১.২ : মেন্ডেল মটরশুটির উপরোক্ত ৭ জোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা

মেন্ডেলের সাফল্যের বা কৃতকার্য হওয়ার কারণ (Reasons behind Mendel's success)

মেন্ডেলের আগেও অনেক বিজ্ঞানী সংকরায়ন পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মেন্ডেলই প্রথম এ ধরনের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে কতকগুলো নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের মূল কারণগুলো হলো–

১. তিনি মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এই গাছ স্বপরাগী। ফুলের বিশেষ গঠনের জন্য বিপরীত পরাগায়নের সম্ভাবনা কম থাকায় পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল।

২. তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সব উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো খাঁটি (pure) অর্থাৎ হোমোজাইগাস ছিল।

৩. তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতিজোড়া জিনের একটি জিন অন্য জিনের উপর সম্পূর্ণ প্রকট (dominant) ছিল।

৪. মটরশুঁটির ডিপ্লয়েড কোষে সাতজোড়া ক্রোমোজোম আছে।

৫. মেন্ডেল যে সাতজোড়া চরিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত বলে কোন লিংকেজ এর ঝামেলা ঘটেনি।

৬. কোন লিংকড চরিত্রের সম্মুখীন হলে মেন্ডেল হয়তোবা দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা দানে ব্যর্থ হতেন। কিন্তু অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মেন্ডেলের নির্ধারিত সাত জোড়া চরিত্রের মধ্যে কোনটাই লিংকড চরিত্র ছিলনা।

৭. সংকরায়ন করার পূর্বে তিনি বারবার উদ্ভিদগুলোর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেছিলেন।

৮. কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তিনি কয়েক বংশধরে উদ্ভিদগুলোর প্রজনন ঘটিয়েছিলেন।

৯. মেন্ডেল অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১০. গাণিতিক পদ্ধতিতে মেন্ডেল তাঁর ফলাফলের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

জিনতত্ত্বে ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দের ব্যাখ্যা

জিনতত্ত্ব সহজভাবে বুঝতে হলে নিম্নোক্ত শব্দগুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

১. **ফ্যাক্টর** (Factor) বা **জিন** (Gene) : DNA অণুর একটি খন্ডাংশ যা জীবের বংশগতির মৌলিক ভৌত ও কার্যিক একক বংশ থেকে বংশান্তরে জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

২. **লোকাস** (Locus) : ক্রোমোজোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থান-এর নাম **লোকাস**। একটি নির্দিষ্ট জিনের অ্যালিলগুলো সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থান করে।

৩. **অ্যালিল বা অ্যালিলোমরফ** (Allele or Allelomorph) : সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন-জোড়ার একটিকে অপরটির **অ্যালিল** বলে। অ্যালিলদুটি একই ধর্মী (যেমন—TT) অথবা একে অপরের বিপরীত ধর্মী (যেমন—Tt) হতে পারে। যখন দুটি বিপরীতধর্মী অ্যালিল থাকে তখন একটিকে **প্রকট অ্যালিল** (অর্থাৎ T), অপরটিকে **প্রচ্ছন্ন অ্যালিল** (t) বলে।

৪. হোমোজাইগাস (Homozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলদুটি সমপ্রকৃতির হলে, তাকে **হোমোজাইগাস** বলে। যেমন-BB = কালো পশম, bb = বাদামী পশম ইত্যাদি।

৫. হেটারোজাইগাস (Heterozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলদুটি অসমপ্রকৃতির হলে, তাকে **হেটারোজাইগাস জীব** বলে। যেমন T এবং t অর্থাৎ Tt-ধারী জীবটি লম্বা হলেও তা হেটারোজাইগাস।

৬. প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) : একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হোমোজাইগাস জীবে (TT এবং tt) সংকরায়ন ঘটালে F_1 জনুতে সৃষ্ট হেটারোজাইগাস জীবে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাকে **প্রকট বৈশিষ্ট্য** বলে। যেমন- F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের লক্ষণের জন্যে একটি করে জিন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে **লম্বা** বৈশিষ্ট্যটি প্রকট ।

৭. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) : হেটারোজাইগাস জীবে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপাদান একত্রে থাকলেও একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, অন্যটি অপ্রকাশিত থাকে। জীবের অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে **প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য** বলে। যেমন- F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি করে জিন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে খাটো বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন।

৮. ফিনোটাইপ (Phenotype) : জিনোটাইপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। এটি জীবের আকার আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে। সদৃশ ফিনোটাইপধারী দুটি জীবের জিনোটাইপ একই রকম বা ভিন্ন হতে পারে। যেমন-বিপরীত লক্ষণযুক্ত লম্বা ও খাটো মটর গাছের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটালে F_1 জনুতে সবগুলো উদ্ভিদই লম্বা আকৃতির হয় যদিও এদের মধ্যে দুধরনের ফ্যাক্টরই (Tt) থাকে। এখানে ফিনোটাইপ হলো **লম্বা**।

৯. জিনোটাইপ (Genotype) : কোনো জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের গঠনকে **জিনোটাইপ** বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা যায়। সদৃশ জিনোটাইপধারী জীবেরা যদি একই পরিবেশে বাস করে তাহলে ওদের ফিনোটাইপও সদৃশ হবে। একটি লম্বা গাছের জিনোটাইপ হতে পারে **TT** বা **Tt** আর খাটো গাছের জিনোটাইপ হবে tt

১০. প্যারেন্টাল জেনারেসন ও অপত্য বংশ (Parental generation & Filial generation) : কোন ক্রসে ব্যবহৃত পিতা মাতাকে "প্যারেন্টাল জেনারেসন" বা P_1 এবং উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে **প্রথম অপত্য বংশ** বা **F_1 জনু** বলে। আবার F_1 সন্তান সন্ততির মধ্যে ক্রস করলে F_2 উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে **দ্বিতীয় অপত্য বংশ** বা **F_2 জনু** বলে।

১১. একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) : জীবের একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন বা ক্রস ঘটানো হয়, তাকে **একসংকর ক্রস** বা **মনোহাইব্রিড ক্রস** বলে। যেমন–কালো ও বাদামী বর্ণের গিনিপিগের মধ্যে ক্রস। মনোহাইব্রিড ক্রসে ২য় বংশধরে (F_2 জনু) প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপাত সাধারণত **৩ : ১** হয়। মেন্ডেল তাঁর প্রথম সূত্রটি একসংকর ক্রসের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করেছিলেন।

১২. দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) : জীবের দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে সংকরায়ন বা ক্রস। যেমন: কালোবর্ণ–ছোটলোমধারী ও বাদামীবর্ণ–লম্বালোমযুক্ত গিনিপিগের ক্রস। ডাইহাইব্রিড ক্রসে ২য় বংশধরে (F_2 জনু) জিনের স্বাধীন সঞ্চারণের ফলে সাধারণত ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে চার ধরনের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সন্ততি পাওয়া যায়।

১৩. টেস্ট ক্রস (Test cross) : F_1 বা F_2 জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবের সাথে সংকরায়ণ বা ক্রস। এভাবে এদের F_1 এবং F_2 জনুর জিনোটাইপ বের করা যায়। যেমন–সংকর লম্বা মটরগাছ (Tt) এবং বিশুদ্ধ খাটো মটরগাছ (tt) এর সংকরায়ন ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক এবং জিনোটাইপিক অনুপাত হবে **১ : ১**।

১৪. ব্যাক ক্রস (Back cross) : F_1 জনুর একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশীয় এক সদস্যের সংকরায়ন।

১৫. জিনোম (Genome) : জীবের একটি জননকোষের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টি।

মেন্ডেল-এর সূত্র (Mendel's Law)

প্রকৃতপক্ষে মেন্ডেল নিজে কোনো মতবাদ প্রবর্তন করেননি। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে সংকরায়ন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের তত্ত্বীয় ও পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে **কার্ল করেন্স** (যিনি ১৯০০ সালে মেন্ডেলের অনুরূপ গবেষণা–ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন) মেন্ডেলের আবিষ্কারকে বংশগতির মৌলিক দুটি সূত্র হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য বলে প্রচার করেন। যেহেতু সূত্রদুটি মেন্ডেলের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত, তাই সূত্রদুটিকে **মেন্ডেল-এর সূত্র** নামে অভিহিত করা হয়। নিচে মেন্ডেল–এর সূত্র দুটি ব্যাখ্যা করা হলো।

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation)

সূত্র : সংকর (hybrid) **জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে গমন করে।**

এ সূত্রকে **মনোহাইব্রিড ক্রস সূত্র** (Law of Monohybrid cross) বা **জননকোষ শুদ্ধতার সূত্র** (Law of Purity of Gamates)-ও বলা হয়।

গিনিপিগে **কালো** বর্ণের জন্য দায়ী জিনকে **B** এবং **বাদামী** বর্ণের জন্য দায়ী জিনকে **b** প্রতীকে চিহ্নিত করলে বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে **BB** এবং বিশুদ্ধ বাদামী বর্ণের গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে **bb**.

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা –

একটি হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ **কালো** (BB) বর্ণের গিনিপিগের সাথে অপর একটি বিশুদ্ধ **বাদামী** (bb) বর্ণের গিনিপিগের সংকরায়ন ঘটালে F_1 জনুতে সকল অপত্য গিনিপিগের বর্ণই হবে **কালো** (Bb) কারণ, কালো বর্ণের অ্যালিল (B) বাদামী বর্ণের অ্যালিল (b)–এর উপর প্রকট গুণসম্পন্ন। উভয় জিন দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকলেও বিনষ্ট বা একীভূত হয়ে যায় না বরং স্বকীয়তা বজায় রেখে অক্ষুন্ন থাকে।

F_2 জনুতে উৎপন্ন অপত্য গিনিপিগের মধ্যে ৩টি কালো এবং ১টি বাদামী বর্ণের গিনিপিগের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ফিনোটাইপের ভিত্তিতে F_2 জনুতে গিনিপিগের কালো ও বাদামী বর্ণের অনুপাত হয় যথাক্রমে **৩ ঃ ১**।

F_2 জনুর সদস্যদের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৩টি প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী (কালো) গিনিপিগের মধ্যে মাত্র ১টি হোমোজাইগাস (BB), বাকি দুটি হেটারোজাইগাস (Bb)। যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি (বাদামী) F_1 জনুতে অবদমিত ছিল, F_2 জনুতে তার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে (bb)। অনুরূপভাবে, যে শুদ্ধ প্রকট বৈশিষ্ট্য (BB) F_1 জনুতে অনুপস্থিত ছিল, সেটিও F_2 জনুতে ফিরে এসেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে প্রথম জনুতে B ও b একসঙ্গে থাকলেও পরস্পরের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়নি বরং **গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে গেছে।** জিনোটাইপিক অনুপাত : ১ : ২ : ১

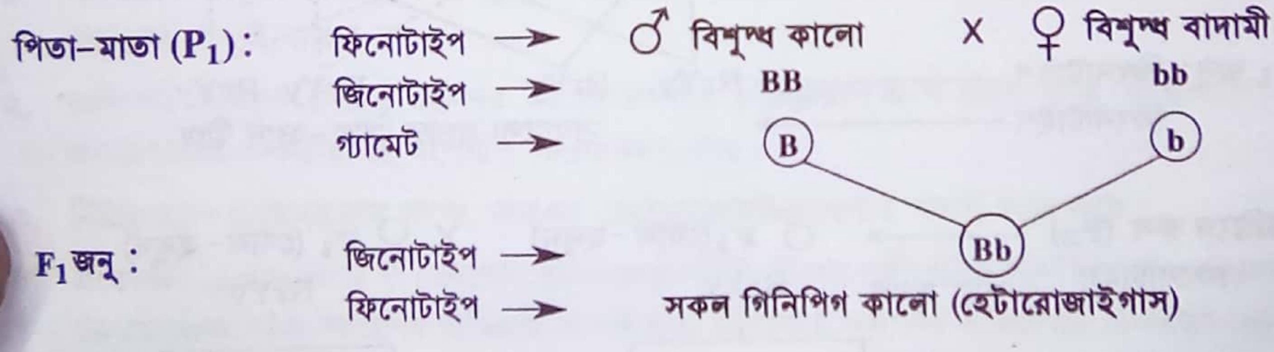

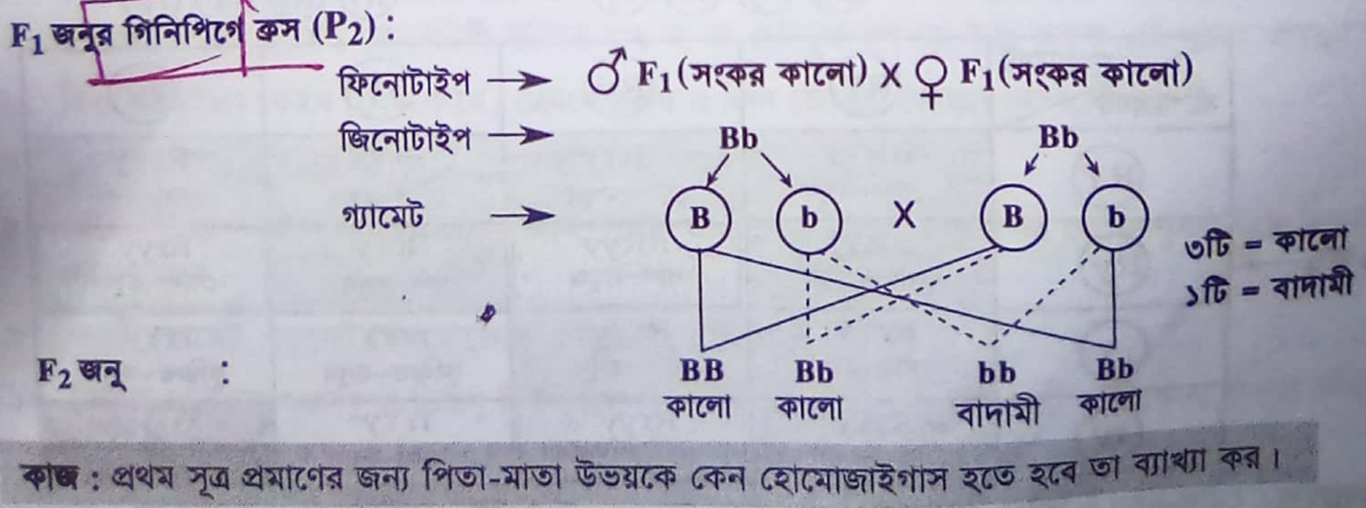

কাজ : প্রথম সূত্র প্রমাণের জন্য পিতা-মাতা উভয়কে কেন হোমোজাইগাস হতে হবে তা ব্যাখ্যা কর।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment)

সূত্র : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে (F_1) কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু গ্যামেট সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করবে। এধরনের সংকরায়নে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের উৎপত্তি হয়।

অন্যভাবে বলা যায়- **একটি জীবের দুই বা ততোধিক জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) গ্যামেট সৃষ্টির সময় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে বিন্যস্ত হয়। এ ব্যাপারে এক জোড়া অন্য জোড়ার উপর নির্ভরশীল নয়।**

এ সূত্র প্রমাণের জন্য মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটান। দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন (ক্রস) ঘটানো হয়, তাকে **দ্বিলক্ষণ সংকরায়ন** বা **ডাইহাইব্রিড ক্রস** (dihybrid cross) বলে।

এমন দুটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) **মটরশুঁটি গাছ** (*Pisum sativum*) নেয়া হলো যার একটি **গোল** ও **হলুদ বর্ণের বীজ** এবং অন্যটি **কুঞ্চিত** ও **সবুজ বর্ণের বীজ** উৎপাদনে সক্ষম।

ধরা যাক, বীজের **গোল** লক্ষণের প্রতীক **R**, **কুঞ্চিত** লক্ষণের প্রতীক **r**, **হলুদ** লক্ষণের প্রতীক **Y** (বড় অক্ষরের), **সবুজ** লক্ষণের প্রতীক **y** (ছোট অক্ষরের), প্রথম বংশধর F_1 **জনু** এবং দ্বিতীয় বংশধর F_2 **জনু**।

মেন্ডেল-এর মতে, প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি করে ফ্যাক্টর (জিন) দায়ী। অতএব, গোল ও হলুদ বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে **RRYY** এবং কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে **rryy.**

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

পিতা-মাতা (P_1): ফিনোটাইপ ⟶ ♂ গোল – হলুদ X ♀ কুঞ্চিত – সবুজ
জিনোটাইপ ⟶ RRYY rryy
গ্যামেট ⟶ (RY) (RY) (ry) (ry)

F_1 জনু: জিনোটাইপ ⟶ RrYy RrYy RrYy RrYy
ফিনোটাইপ ⟶ সবগুলো সংকর গোল – হলুদ বীজ

F_1 জনুর উদ্ভিদে ক্রস (P_2) ⟶ ♂ F_1(গোল – হলুদ) X ♀ F_1 (গোল – হলুদ)
জিনোটাইপ ⟶ RrYy RrYy
গ্যামেট ⟶ (RY) (Ry) (rY) (ry) (RY) (Ry) (rY) (ry)

F_2 জনু ⟶

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	(RY)	(Ry)	(rY)	(ry)
(RY)	RRYY গোল-হলুদ	RRYy গোল-হলুদ	RrYY গোল-হলুদ	RrYy গোল-হলুদ
(Ry)	RRYy গোল-হলুদ	RRyy গোল-সবুজ	RrYy গোল-হলুদ	Rryy গোল-সবুজ
(rY)	RrYY গোল-হলুদ	RrYy গোল-হলুদ	rrYY কুঞ্চিত-হলুদ	rrYy কুঞ্চিত-হলুদ
(ry)	RrYy গোল-হলুদ	Rryy গোল-সবুজ	rrYy কুঞ্চিত-হলুদ	rryy কুঞ্চিত-সবুজ

ফলাফল : গোল-হলুদ = ৯টি, গোল-সবুজ = ৩টি, কুঞ্চিত-হলুদ= ৩টি এবং কুঞ্চিত-সবুজ = ১টি

অনুপাত = ৯ : ৩ : ৩ : ১

বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব (Chromosomal Theory of Inheritance)

মেণ্ডেল তাঁর সংকরায়ন পরীক্ষার ফল থেকে বুঝতে পারেন যে কোনো জীবের প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি উপাদান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ উপাদান জীবদেহে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট গঠনকালে ঐ উপাদান সংখ্যায় অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু উপাদানটি কী, গ্যামেটের কোথায় এটি অবস্থিত এবং এসব উপাদান কীভাবে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে–এসব বিষয়ে মেণ্ডেল অবগত ছিলেন না।

১৯০০ সালে মেণ্ডেল তত্ত্বের পুনরাবিষ্কারের পর ক্রোমোজোম ও মেণ্ডেলের উপাদানের মধ্যে বেশ কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা এবং দেহকোষে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। জোড়ার একটি পিতার কাছ থেকে, অপরটি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। অর্থাৎ মানুষের দেহকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২৩টি আসে পিতার কাছ থেকে, বাকি ২৩টি মায়ের কাছ থেকে। ২৩টি করে ক্রোমোজোম শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে থাকে, দুটি কোষের মিলনে ৪৬টি ক্রোমোজোম নিয়ে **জাইগোট** কোষের সৃষ্টি হয়। মেন্ডেল একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া উপাদানের কথা বলেছিলেন, যার একটি পিতা ও একটি মাতার কাছ থেকে আসে, যেমনটি ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

১৯০২ সালে বিজ্ঞানী **সাটন** (S.W. Sutton) ও **বোভেরি** (T. Bovery) পৃথকভাবে ক্রোমোজোম ও মেণ্ডেলের উপাদানের মধ্যে মিলের কথাটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। এ নিয়ে প্রায় এক যুগ ধরে বিভিন্ন জীব-জন্তুর উপর গবেষণা চলেছে। পরে জানা গেল যে মেন্ডেলের উপাদান বা জিনের অবস্থান ক্রোমোজোমে, তাই বংশানুক্রমিক গতিপ্রকৃতির বিষয়ে ক্রোমোজোম আর উপাদানের মধ্যে এত সাদৃশ্য। গবেষণার ফলাফল থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জিন ও ক্রোমোজোম অনেক দিক দিয়ে একই রকম আচরণ করে। তা ছাড়া বংশগতি নির্ধারণের সময় জিন ও ক্রোমোজোম সমান্তরাল আচরণ প্রদর্শন করে। একেই **বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব** বলা হয়।

সাটন ও বোভেরি প্রবর্তিত তত্ত্বের আলোকে বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের মূল ভিত্তি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. একমাত্র শুক্রাণু ও ডিম্বাণুই যেহেতু বংশপরম্পরার সেতু হিসেবে কাজ করে তাই সমস্ত বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য এগুলোর মধ্যেই বাহিত হয়।
২. জাইগোট সৃষ্টিতে যেহেতু শুক্রাণুর মস্তকে অবস্থিত **নিউক্লিয়াস** অংশ গ্রহণ করে, তাই ধারণা করা যায় যে জননকোষের নিউক্লিয়াসই বংশগতি পদার্থ বহন করে।
৩. নিউক্লিয়াসে **ক্রোমোজোম** থাকে, অতএব ক্রোমোজোমই বংশগতি পদার্থ বহন করে।
৪. প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম বা ক্রোমোজোম-জোড় নির্দিষ্ট জীবের পরিস্ফুটনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। একটি ক্রোমোজোম বা অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে জীবদেহে অঙ্গহানি ও কার্যগত অক্ষমতা দেখা দিতে পারে।
৫. বংশগতি পদার্থের মতো ক্রোমোজোমও জীবদেহে আজীবন ও বংশপরম্পরায় তাদের সংখ্যা, গঠন ও স্বকীয়তা বজায় রাখে। কোনোটাই হারিয়ে যায় না বা একীভূত হয় না, বরং একক-এর মতো আচরণ করে।
৬. ডিপ্লয়েড (2n) কোষে (দেহকোষে) ক্রোমোজোম ও জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে।
৭. ক্রোমোজোমে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে (লোকাসে) জিন অবস্থান করে।
৮. মিয়োসিসের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোম-জোড় ও জিন স্বাধীনভাবে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে জননকোষে প্রবেশ করে।
৯. একটি গ্যামেট একসেট ক্রোমোজোম ও অ্যালিল বহন করে।
১০. নিষেক প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টির ফলে অপত্য জীবদেহে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম ও জিনসংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায়: ক্রসিংওভার, জিন লিংকেজ, সেক্সলিংকেজ

মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম (Deviations of Mendel's Laws)

মেন্ডেলের বংশগতি সম্বন্ধীয় সূত্র আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবে ঐ একই ধরনের পরীক্ষা করে দেখেন যে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে মেন্ডেলের পরীক্ষার ফলাফলের অনেক ক্ষেত্রে মিল নেই। এসব ফলাফল মেন্ডেলের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতভাবে মিলন সূত্রের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। নিচে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ব্যতিক্রমের বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম

১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance)– ফলাফল ১ : ২ : ১

যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবে সংকরায়ন (ক্রস) ঘটে কিন্তু প্রথম বংশধরে (F_1 জনুতে) প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে **অসম্পূর্ণ প্রকটতা** বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে **ইন্টারমিডিয়েট জিন** (intermediate gene) বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১ : ২ : ১ হয়।

উদাহরণ : সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*)-র **লাল ফুল**বিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং **সাদা ফুল**বিশিষ্ট উদ্ভিদের সংকরায়ন করলে প্রথম বংশধরে **গোলাপী** (pink) বর্ণের ফুল পাওয়া যায়। প্রথম বংশধরের উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন দ্বিতীয় বংশধরে লাল, গোলাপী ও সাদা ফুলের অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২ : ১।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক– ফুলের **লাল** বর্ণের প্রতীক = R, **সাদা** বর্ণের প্রতীক = r

পিতা–মাতা (P_1) ⟶ মাতা ♀ × পিতা ♂

ফিনোটাইপ ⟶ **লাল ফুল** **সাদা ফুল**

জিনোটাইপ ⟶ RR rr

গ্যামেট ⟶ (R) (R) (r) (r)

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ Rr Rr Rr Rr

ফিনোটাইপ ⟶ সবকটি গোলাপী ফুল

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) ⟶ মাতা ♀ × পিতা ♂

ফিনোটাইপ ⟶ **গোলাপী ফুল** **গোলাপী ফুল**

জিনোটাইপ ⟶ Rr Rr

গ্যামেট ⟶ (R) (r) (R) (r)

F_2 জনু ⟶

স্ত্রীগ্যামেট / পুংগ্যামেট	(R)	(r)
(R)	**RR** লাল	Rr গোলাপী
(r)	Rr গোলাপী	rr সাদা

অর্থাৎ ১টি লাল, ২টি গোলাপী এবং ১টি সাদা।
(অনুপাত ১ : ২ : ১)

ব্যাখ্যা : এখানে লাল ফুলের জন্য RR এবং সাদা ফুলের জন্য rr জিন দেখানো হয়েছে। R–এর সম্পূর্ণ প্রকটতা থাকলে F_1–উদ্ভিদের ফুল লাল রং–এর হতো এবং F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক অনুপাত হতো ৩ : ১। কিন্তু R–এর অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণেই F_1 হেটারোজাইগাস (Rr)–এর বর্ণ গোলাপী বা পিংক (Pink) এবং F_2 বংশধরে ১ : ২ : ১ ফিনোটাইপিক অনুপাতের (লাল, গোলাপী, সাদা) সৃষ্টি হয়েছে।

২. সমপ্রকটতা (Co-dominance) – ফলাফল ১ : ২ : ১

সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দুটি অ্যালিল হেটারোজাইগাস অবস্থায় যখন প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের পরিবর্তে উভয়েই সমানভাবে প্রকাশিত হয়, তখন জিনের এ ধরনের স্বভাবকে **সমপ্রকটতা** বলে। অন্যভাবে বলা যায়, **সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বলে**। এতে মেন্ডেলিয়ান ৩ : ১ অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে ১: ২ : ১ রূপে প্রকাশ পায়।

কালো ও **সাদা** বর্ণের আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে সমপ্রকটতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে **কালো পালক** (BB) এবং **সাদা পালক** (bb)-এর মোরগ-মুরগিতে ক্রস ঘটানো হলে F_1 জনুর সকল মোরগ-মুরগিই কালো বা সাদা না হয়ে সমপ্রকটতার কারণে **কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত** (Bb) হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

পিতা–মাতা (P_1) : ⟶ **কালো বর্ণের মোরগ X সাদা বর্ণের মুরগি**

জিনোটাইপ ⟶ BB bb

গ্যামেট ⟶ (B) (b)

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ Bb

ফিনোটাইপ ⟶ **সবকটি সাদা ছোপযুক্ত মোরগ-মুরগি**

পিতা–মাতা (P_2) : ⟶ সাদা ছোপযুক্ত মোরগ X সাদা ছোপযুক্ত মুরগি

জিনোটাইপ ⟶ Bb Bb

গ্যামেট ⟶ (B) (b) X (B) (b)

F_2 জনু : জিনোটাইপ ⟶ BB Bb Bb bb

ফিনোটাইপ ⟶ (কালো) (সাদাছোপ) (সাদাছোপ) (সাদা)

অনুপাত : ১ : ২ : ১

৩. মারণ জিন বা লিথাল জিন (Lethal Gene) — অনুপাত ২ : ১

যেসব জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে সেসব জিনকে **লিথাল জিন** বলে। কোনো জিনের **মিউটেশন** (mutation; বংশগত বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তন) ঘটার পর সংশ্লেষিত প্রোটিন (এনজাইম) যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং উক্ত প্রোটিনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব যদি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হয় তবে হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে।

লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য : (i) লিথাল জিন একধরনের **মিউট্যান্ট জিন** যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। (ii) প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থাতেই জীবের মৃত্যু কিংবা আঙ্গিক বৈকল্য ঘটাতে পারে। (iii) প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন সবসময়ই হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়। (iv) লিথাল জিনের প্রভাবে ৩ : ১ অনুপাতের পরিবর্তে ২ : ১ অনুপাত প্রকাশিত হয়।

ফরাসী জিনতত্ত্ববিদ **লুসিয়েন ক্যুয়েনো** (Lucien Cuénot, 1905) সর্বপ্রথম ইঁদুরের গায়ের বর্ণের ক্ষেত্রে লিথাল জিনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। তাঁর পরীক্ষায় দেখা যায় যে দুটি **হলুদ** বর্ণের ইঁদুরে ক্রস করানো হলে সব সময়ই ২ : ১ অনুপাতে যথাক্রমে হলুদ ও মেটে রঙের ইঁদুর পাওয়া যায়। পরবর্তী গবেষকরা প্রমাণ করেন যে দুটি হলুদ বর্ণের ইঁদুরে ক্রস করা হলে ২৫% ইঁদুর ভ্রূণীয় অবস্থায়ই মারা যায়। তাই **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ : ১ হয়**।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক, ইঁদুরের গায়ের **হলুদ** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রকট জিন **Y** এবং **মেটে** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন y.

মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস হলুদ বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে **YY** এবং বিশুদ্ধ মেটে বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে yy. কিন্তু প্রকৃতিতে যে সব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তার কোনটিই বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস (**YY**) জিনোটাইপধারী নয়। কারণ **Y** জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথাল জিন হিসেবে কাজ করে ভ্রূণ অবস্থায় ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়। তাই প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তারা সবাই হেটারোজাইগাস অর্থাৎ সংকর (**Yy**) প্রকৃতির।

পিতা-মাতা : ফিনোটাইপ → **পুরুষ হলুদ ইঁদুর (সংকর) X স্ত্রী হলুদ ইঁদুর (সংকর)**

জিনোটাইপ → Yy   Yy

গ্যামেট → (Y) (y) X (Y) (y)

নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল দেখানো হলো

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	(Y)	(y)
(Y)	**YY (মৃত)**	**Yy (হলুদ)**
(y)	**Yy (হলুদ)**	yy (মেটে)

অনুপাত = ২টি হলুদ (Yy) : ১টি মেটে (yy)

লিথাল জিনের প্রভাবে ক্রীপার (Creeper) মুরগী, পা-বিহীন (Amputed) বাছুর এবং মানুষে ব্র্যাকিফ্যালাঞ্জি (Brachyphalangy), হিমোফিলিয়া (Haemophilia), জন্মগত ইকথিওসিস (Congenital Ichthyosis) এবং থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) হতে দেখা যায়।

এমন কিছু লিথাল জিনও পাওয়া যায়, যার প্রভাবে বাহক জীব একেবারে ছোট অবস্থায় মারা যায় না। তারা বড় হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধিও ঘটায়। যে সব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০% এর বেশি জীব মারা যায় সেগুলোকে **সেমিলিথাল জিন** (semilethal gene) বলে। অন্যদিকে, যেসব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০ এর কম সংখ্যক জীব মারা যায় সেগুলোকে **সাবভাইটাল জিন** (subvital gene) বলে। মানুষে **হিমোফিলিয়া** রোগ সৃষ্টিকারী লিথাল জিন সেমিলিথাল ধরনের। **ড্রসোফিলা** মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টিকারী লিথাল জিন সাবভাইটাল ধরনের।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম

১. পরিপূরক জিন (Complementary Gene) – ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৭

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন জিনদুটিকে পরস্পরের পরিপূরক জিন বলে এবং এ অবস্থাকে সহপ্রকটতা বলা হয়।

Lathyrus odoratus নামক মিষ্টি মটর উদ্ভিদে **সাদা** ফুলবিশিষ্ট দুটি আলাদা **স্ট্রেইন** (strain) পাওয়া যায়। এই স্ট্রেইনদুটির মধ্যে সংকরায়ন করলে F_1 জনুর সব উদ্ভিদের ফুল **বেগুনি** হয়। কিন্তু F_2 জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত দাঁড়ায় ৯ : ৭।

নিচে জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো–

ধরা যাক, সাদা ফুলবিশিষ্ট স্ট্রেইন দুটির জিনোটাইপ যথাক্রমে AAbb এবং aaBB। এদের সংকরায়নের ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো।

পিতা–মাতা (P_1) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ সাদা ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর X ♀ সাদা ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর

জিনোটাইপ ⟶ AAbb X aaBB

গ্যামেট ⟶ (Ab) (Ab) X (aB) (aB)

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb AaBb AaBb

ফিনোটাইপ ⟶ সবগুলো বেগুনি ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ বেগুনি ফুল X ♀ বেগুনি ফুল

জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb

গ্যামেট ⟶ (AB) (Ab) (aB) (ab) X (AB) (Ab) (aB) (ab)

F_2 জনু ⟶

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	(AB)	(Ab)	(aB)	(ab)
(AB)	AABB বেগুনি ফুল	AABb বেগুনি ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল
(Ab)	AABb বেগুনি ফুল	AAbb সাদা ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল
(aB)	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	aaBB সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল
(ab)	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল	aabb সাদা ফুল

ফিনোটাইপের অনুপাত = ৯টি বেগুনি ফুল : ৭টি সাদা ফুল

ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে প্রকট জিন A ও B একত্রে ক্রিয়া করে থাকে। উপরের চেকার বোর্ডে দেখা যায় যেসব জিনোটাইপে A ও B একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপ বেগুনি হয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে A বা B অর্থাৎ ঐ দুটি জিনের মাত্র একটি আছে বা কোনটিই নেই সেসব ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ সাদা হয়েছে। পরিপূরক জিনের ক্রিয়ার ফলেই F_2 জনুর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে ৯ : ৭ অনুপাত সৃষ্টি হয়েছে।

২. এপিস্ট্যাসিস (Epistasis) —ফিনোটাইপিক অনুপাত: ১৩:৩

কিছু ক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বাধা দেয়। এভাবে, **একটি জিন যখন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক** (non-allelic) **জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।** যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় সে জিনকে **এপিস্ট্যাটিক জিন** (epistatic gene), আর যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিনটিকে **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** (hypostatic gene) বলে।

ক. প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant Epistasis) — অনুপাত ১৩ : ৩

যখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে **বেটসন** (Bateson) এবং **পানেট** (Punnett) পরিচালিত এক পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় যে **সাদা লেগহর্ণ** (Leghorn) গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রকট জিন (C) থাকে। কিন্তু এপিস্ট্যাটিক জিন (I)- এর কারণে রঙিন পালক সৃষ্টি হতে না পারায় পালকগুলো সাদা হয়। F_1 জনুতে সব সাদা পালক-বিশিষ্ট হলেও F_2 জনুতে ১৩ : ৩ অনুপাতে সাদা ও রঙিন পালক-বিশিষ্ট মোরগ-মুরগী সৃষ্টি হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ধরা যাক, সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন **C** এবং
সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন **I**.
অতএব, সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ হবে **CCII** এবং সাদা ওয়াইনডটের জিনোটাইপ হবে **ccii.**
অর্থাৎ এক্ষেত্রে **C** হচ্ছে প্রকট **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** এবং **I** প্রকট **এপিস্ট্যাটিক জিন।**

সাদা লেগহর্ণ এবং সাদা ওয়াইনডট-এর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে বিস্ময়কর ফলাফল লক্ষ করা গেছে। একটি **সাদা পালকযুক্ত লেগহর্ণ**–এর সাথে **সাদা পালকযুক্ত ওয়াইনডট**–এর ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে (F_1 জনু) **সবগুলো শাবকই সাদা পালকযুক্ত** পাওয়া যাবে।

পিতা – মাতা (P_1) : ♂ **সাদা লেগহর্ণ** × ♀ **সাদা ওয়াইনডট**
জিনোটাইপ ⟶ CCII ccii
গ্যামেট ⟶ (CI) (ci)
F_1 জনু ⟶ CcIi (সাদা)
F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ♂CcIi (সাদা) × ♀CcIi (সাদা)

F_2 জনু ⟶

♀ \ ♂	(CI)	(Ci)	(cI)	(ci)
(CI)	CCII সাদা	CCIi সাদা	CcII সাদা	CcIi সাদা
(Ci)	CCIi সাদা	CCii রঙিন	CcIi সাদা	Ccii রঙিন
(cI)	CcII সাদা	CcIi সাদা	ccII সাদা	ccIi সাদা
(ci)	CcIi সাদা	Ccii রঙিন	ccIi সাদা	ccii সাদা

অনুপাত = ১৩ (সাদা) : ৩ (রঙিন)

F_1 জনুর মোরগ–মুরগীর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা গেছে F_2 জনুতে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের পাখিরই আবির্ভাব ঘটে এবং এদের অনুপাত দাঁড়ায় ১৩ : ৩। উপরের চেকার বোর্ডে ফলাফল দেখানো হয়েছে।

চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিন I এর উপস্থিতি C জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সবসময় বাধাদান করে। কেবল I এর অনুপস্থিতিতেই C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। জিন I বিশেষ ধরনের এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব হয় না, দমিত থাকে।

খ. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Duplicate Recessive Epistasis)—অনুপাত ৯ : ৭

দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল যখন পরস্পরের (একে অপরের) প্রকট অ্যালিলকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

মানুষে জন্মগত **মূক-বধিরতা** দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের অন্যতম উদাহরণ। দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এর জন্য দায়ী। এ দুটি জিনের একটি যখন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে তখন অন্য প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। অর্থাৎ উল্লিখিত দুজোড়া প্রচ্ছন্ন জিনের যেকোনো একজোড়া থাকলে এবং অন্য জোড়ার প্রকট জিন থাকলেও যেকোনো ব্যক্তি জন্মগত মূকবধির (deaf-mute) হবে। এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন জিন-জোড় প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মনে করি d ও e দুটি প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব ddEE ও DDee জিনোটাইপধারী ব্যক্তি মূকবধির হবে। এক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন d ও e হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন EE ও DD বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। তাই মূকবধিরতা প্রকাশ পায়।

পিতা–মাতা(P_1) : ফিনোটাইপ → ♂ মূকবধির × ♀ মূকবধির

জিনোটাইপ → DDee ddEE

গ্যামেট → (De) (dE)

DdEe

F_1 জনু : জিনোটাইপ → DdEe

ফিনোটাইপ → সবাই স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস(P_2) : ♂ স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম × ♀ স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম

জিনোটাইপ → DdEe DdEe

গ্যামেট → (DE) (De) (dE) (de) × (DE) (De) (dE) (de)

F_2 জনু →

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	(DE)	(De)	(dE)	(de)
(DE)	DDEE স্বাভাবিক	DDEe স্বাভাবিক	DdEE স্বাভাবিক	DdEe স্বাভাবিক
(De)	DDEe স্বাভাবিক	DDee মূকবধির	DdEc স্বাভাবিক	Ddee মূকবধির
(dE)	DdEE স্বাভাবিক	DdEe স্বাভাবিক	ddEE মূকবধির	ddEe মূকবধির
(de)	DdEe স্বাভাবিক	Ddee মূকবধির	ddEe মূকবধির	ddee মূকবধির

ফলাফল : ৯ সন্তান স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম এবং ৭ সন্তান মূকবধির

একজন মূকবধির পুরুষের (DDee) সাথে একজন মূকবধির মহিলার (ddEE) বিয়ে হলে তাদের সকল সন্তান স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হবে। ঐ সন্তানদের জিনোটাইপের অনুরূপ জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হলে (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূকবধির সন্তান ৯ : ৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে। উপরে ছকের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট রোগ:- অটিজম, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস টাইপ – 2

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance) বা বহুজিনীয় উত্তরাধিকার

মেন্ডেলের মতে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একজোড়া **ফ্যাক্টর** বা **জিন** দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন লোকাসে অবস্থানকারী (নন-অ্যালিলিক) একাধিক জিন জীবের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন-মানুষের উচ্চতা, গায়ের রং, চোখের রং, গাভির দুধ, ভুট্টা বা গমের দানার রং ইত্যাদি **পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য** (quantitative traits) একাধিক জিনের সমন্বিত প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয়।

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত নন-অ্যালিলিক জিনের একটি গ্রুপ সম্মিলিতভাবে কোন জীবের একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করলে তখন সেই জিন-গ্রুপকে **পলিজিন** (polygene) বলে। **পলিজিনে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের বংশগতিকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলা হয়।** জিনতত্ত্ববিদ K. Mather, ১৯৫৪ সালে পলিজিন নামকরণ করেন। পলিজিনের প্রভাব **ক্রমবর্ধিষ্ণু** (cumulative) হওয়ায় এমন বৈশিষ্ট্যকে **মাত্রিক চরিত্র** (quantitative character) বলা হয়।

পৃথিবীতে নিগ্রোদের মতো **কুচকুচে কালো** থেকে শুরু করে ককেশীয়দের মতো **ধবধবে ফর্সা** তথা **শ্বেতাঙ্গ** পর্যন্ত নানা প্রকার গায়ের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। নিগ্রো ও শেতাঙ্গের মধ্যে বিয়ে হলে এদের সন্তানদের গায়ের বর্ণ **মাঝারি** অর্থাৎ **মিউল্যাটো** (mulatto) হয়। মিউল্যাটোদের মধ্যে বিয়ে হলে নানা ধরনের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যে বিয়ের ফলে সৃষ্ট মিউল্যাটোদের (মাঝারি বর্ণ) গায়ের বর্ণের উত্তরাধিকার পলিজেনিক উত্তরাধিকারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একজন নিগ্রো পুরুষের সাথে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার বিয়ে হলে F_1 ও F_2 জনুর ফলাফল অপর পৃষ্ঠায় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ধরি, নিগ্রোদের বর্ণ সৃষ্টিকারী দুজোড়া জিন হচ্ছে $B_1 B_1 B_2 B_2$ এবং শ্বেতাঙ্গদের এ রকম দুজোড়া জিন $b_1 b_1 b_2 b_2$। এধরনের নিগ্রো পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গ মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের ক্রসের ফলে সৃষ্ট F_1 জনুর জিনোটাইপ হয় $B_1 b_1 B_2 b_2$এবং ফিনোটাইপ হয় **মিউল্যাটো** বা মাঝামাঝি। F_1 জনু মিউল্যাটো বা মাঝামাঝিদের মধ্যে ক্রস করলে F_2 তে নানা রকম গায়ের রংবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। এসব জিনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকটতা (dominance) নেই। প্রকট জিনের সংখ্যা যত বেশি হবে গায়ের রং-এর গাঢ়ত্ব তত বেড়ে যাবে।

C. B. Davenport ১৯১৩ সালে প্রমাণ করেন যে, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের গায়ের রং-এর বংশগতি দুজোড়া জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিগ্রোদের দুজোড়া বর্ণ সৃষ্টিকারী জিন রয়েছে যা **মেলানিন** (melanin; মেরুদন্ডী প্রাণীর ত্বকে উপস্থিত কালো বা গাঢ় বাদামী বর্ণের রঞ্জক) সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এসব জিনে কোনো প্রকটতা দেখা যায় না। তবে এদের সমপরিমাণ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব দেখা যায়। শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে এ জিনগুলোর অ্যালিল মেলানিন সঞ্চয়ে সাহায্য করে না।

১৯০৮ সালে সুইডিস বিজ্ঞানী Nilsson-Ehle গমের বীজের রং নিয়ে পরীক্ষা করার সময় **লাল** বীজযুক্ত গমের সাথে **সাদা** বীজযুক্ত গমের সংকরায়ন ঘটান। F_1 বংশধরে তিনি সকল গমের রং **মধ্যম লাল** পেলেও F_2 বংশধরে ১৫টি লাল এবং ১টি **সাদা** শস্যযুক্ত উদ্ভিদ পান। তিনি ১৫টি লাল শস্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে লালবর্ণের গাঢ়ত্বের তারতম্য লক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই তারতম্য বিচার করে তিনি ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ (গাঢ় লাল : লাল : মধ্যম লাল : ফিকে লাল : সাদা) অনুপাত পেয়েছিলেন।

কাজ : মনে করি, গমের দানার লাল রং সৃষ্টিকারী দুটি ডুপ্লিকেট জিন হচ্ছে R_1r_1 এবং R_2r_2। **অত্যন্ত গাঢ় লাল** দানাযুক্ত ($R_1R_1R_2R_2$) উদ্ভিদের সাথে **সাদা** দানাযুক্ত ($r_1r_1r_2r_2$) উদ্ভিদের সংকরায়ন ঘটালে F_1 এবং F_2 বংশধরে যে যে ধরনের বর্ণবিশিষ্ট গমের দানা পাওয়া যাবে তা চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও।

ZZ - ZW পদ্ধতি — পাখি, প্রজাপতি, মাছ

ZZ- ZO - মথ, প্রজাপতি

লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Sex Determination, XX–XY, XX–XO)

যে ক্রোমোজোমের মাধ্যমে জীবের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, তাকে **সেক্স ক্রোমোজোম** বলে। এ ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারনত **X** ও **Y** বা **O** ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মানুষের প্রতিকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে **২২ জোড়া** উভয় লিঙ্গে একই রকম এবং সেগুলোকে **অটোজোম** (autosome) বলে। কিন্তু **২৩তম জোড়ার** ক্রোমোজোম নারী ও পুরুষ সদস্যে ভিন্নতর এবং এগুলোকে **হেটারোজোম** (heterosome) বা **সেক্স ক্রোমোজোম** (sex chromosome) বলা হয়।

নারী সদস্যে যেসব গ্যামেট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু X ক্রোমোজোম থাকে। এ কারণে নারীকে **হোমোগ্যামেটিক সেক্স** এবং এসব গ্যামেটকে **হোমোগ্যামেট** বলে। অন্যদিকে, পুরুষ সদস্যে দুধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হয়। এক ধরনের গ্যামেটে থাকে X ক্রোমোজোম, অন্যধরনের গ্যামেটে থাকে Y ক্রোমোজোম। পুরুষকে তাই **হেটারোগ্যামেটিক সেক্স** এবং এসব গ্যামেটকে **হেটারোগ্যামেট** বলে।

পুরুষ হেটারোগ্যামেসিস প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত দুই প্রকার।

১. XX–XY পদ্ধতি

(মানুষ, ড্রসোফিলা, বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ এবং গাঁজা, তেলাকুচা, ইলোডিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণ)

এ পদ্ধতি অনুযায়ী স্ত্রী **হোমোগ্যামেটিক** বা XX এবং পুরুষ **হেটারোগ্যামেটিক** বা XY। স্ত্রী মাত্র এক ধরনের ডিম্বাণু (X) উৎপন্ন করে। কিন্তু পুরুষ দুরকমের শুক্রাণু (X এবং Y) গ্যামেট সৃষ্টি করে। X-বাহী ডিম্বাণুর সাথে X-বাহী শুক্রাণুর মিলন হলে **কন্যা** (XX) সন্তান এবং X-বাহী ডিম্বাণুর সাথে Y-বাহী শুক্রাণুর মিলন হলে **পুরুষ** (XY) সন্তান জন্ম হবে।

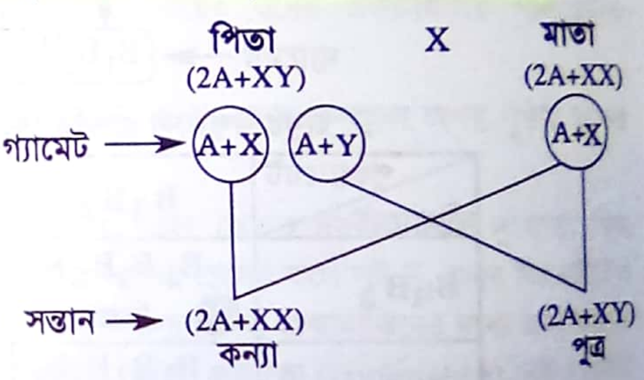

চিত্র : XX-XY পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ

২. XX–XO পদ্ধতি

(ফড়িং, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা ও হেটারোপ্টেরা শ্রেণির লিঙ্গ নির্ধারণ)

ফড়িং, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা ও হেটারোপ্টেরাভূক্ত পতঙ্গে XX–XO পদ্ধতির লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। এখানে স্ত্রী হোমোগ্যামেটিক অর্থাৎ XX সেক্স-ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। কিন্তু পুরুষে Y ক্রোমোজোম অনুপস্থিত। স্ত্রীর ক্রোমোজোম ২A + XX এবং পুরুষের ক্রোমোজোম ২A + XO (Y না থাকায় 'O' শূন্য লেখা হয়)। স্ত্রী হোমোগ্যামেটিক, কাজেই সমস্ত ডিম্বাণু একই ধরনের (A + X)। কিন্তু পুরুষে দুধরনের গ্যামেট [(A + X) এবং (A + O)] উৎপন্ন হয়।

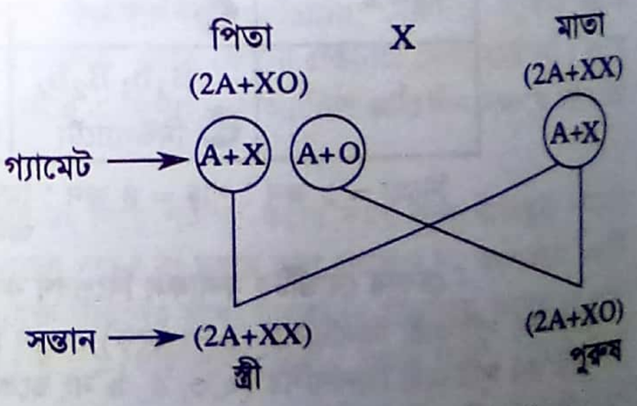

চিত্র : XX-XO পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ

প্রথম প্রকারের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে স্ত্রী সন্তান (২A + XX), কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে পুরুষ সন্তানের (২A + XO) সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদে সচরাচর এ ধরনের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখা যায় না। তবে *Dioscorea sinuata* উদ্ভিদে এ ধরনের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখা যায়।

সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার (Sex-linked Disorders)

প্রাণীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সেক্স ক্রোমোজোমে উপস্থিত জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেক্স ক্রোমোজোম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এসব বৈশিষ্ট্যকে **সেক্স-লিংকড বৈশিষ্ট্য** (sex linked characters) বলে। এসব বৈশিষ্ট্য সেক্স ক্রোমোজোমের সঞ্চারণ অনুযায়ী বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। **সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সেক্স-লিঙ্কড বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে সেক্স-লিংকড ইনহেরিট্যান্স** (Sex linked inheritance) **বলে।** মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টি সেক্স-লিংকড জিন পাওয়া যায়। মানুষের যেসব জিন (X ও Y) নিয়ন্ত্রিত বংশগতিয় রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের **সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার** বা **লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা** বলে। মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত এরকম কয়েকটি রোগ হলো– লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (red-green colorblindness), হিমোফিলিয়া (hemophilia), ডুসেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি (Duchenne Muscular Dystrophy)। মানুষের Y জিন নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য হলো কানের লোম।

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Red-Green Color-Blindness)

মানুষের চোখের রেটিনায় বর্ণসংবেদী **কোন কোষ** (cone cell) উৎপাদনের জন্য একটি প্রকট X-লিংকড জিন প্রয়োজন। কোন-কোষ তিন ধরনের। প্রত্যেকটি ধরন একেক বিশেষ রঙের প্রতি সংবেদনশীল। যেমন- লাল, সবুজ ও বেগুনি। এ জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (অর্থাৎ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী হচ্ছে X-লিংকড অ্যালিলের উপস্থিতি) বর্ণসংবেদী কোন-কোষ উৎপাদনে অক্ষম। হোমোজাইগাস নারী (cc) ও পুরুষ (cY) লাল ও সবুজ বর্ণের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে এ জিনটি হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন না হলে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায় না। কিন্তু পুরুষে একটি প্রচ্ছন্ন জিনই সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সক্ষম।

বর্ণান্ধ পুরুষ ও **স্বাভাবিক** দৃষ্টিসম্পন্ন নারীর মধ্যে বিয়ে হলে F_1 জনুর পুত্র বা কন্যা সবাই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কন্যাদের সবাই হবে বর্ণান্ধ জিনের বাহক এবং পরবর্তী বংশের অর্ধেকে এ জিন সঞ্চারিত হবে।

পিতা–মাতা (P_1): ফিনোটাইপ → বর্ণান্ধ পুরুষ × স্বাভাবিক নারী

জিনোটাইপ → X^cY X^+X^+

গ্যামেট → (X^c) (Y) (X^+) (X^+)

জনু: জিনোটাইপ → X^cX^+ X^cX^+ X^+Y X^+Y

ফিনোটাইপ → বর্ণান্ধবাহক কন্যা স্বাভাবিক পুত্র

সুতরাং বিয়ের আগে বর্ণান্ধতার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। কারণ রাস্তায় যান চলাচলে লাল ও সবুজ আলো গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক-সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া পছন্দের ফুল উপহার দিতে কিংবা বাজার থেকে কাঁচা-পাকা ফল বা জামা-কাপড় কিনতেও বর্ণান্ধদের বেশ বিব্রত হতে হয়।

F_1 জনুর সন্তানদের অনুরূপ জিনোটাইপধারী (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) **স্বাভাবিক** দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের সাথে **বর্ণান্ধবাহক** মহিলার বিয়ে হলে ঐ মহিলার চার সন্তানের মধ্যে দুজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্ম লাভ করবে।

পিতা–মাতা (P_2): ফিনোটাইপ → স্বাভাবিক পুরুষ × বর্ণান্ধবাহক মহিলা

জিনোটাইপ → X^+Y X^+X^c

গ্যামেট → (X^+) (Y) × (X^+) (X^c)

F_2 জনু →

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	(X^+)	(Y)
(X^+)	X^+X^+ স্বাভাবিক কন্যা	X^+Y স্বাভাবিক পুত্র
(X^c)	X^+X^c বর্ণান্ধবাহক কন্যা	X^cY বর্ণান্ধ পুত্র

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (Muscular Dystrophy)

মানুষে অনেক ধরনের বংশগত রোগ দেখা যায়। এসব রোগ জেনেটিক বা জিনঘটিত রোগ-ব্যাধি নামে পরিচিত। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিও একটি জিনঘটিত রোগ। প্রধানত কঙ্কালিক ও হৃৎপেশি এবং কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে এ রোগ দেখা যায়। একটি সেক্স-লিংকড জিনের বিশৃঙ্খলার কারণে প্রধানত শিশুদেহে প্রকাশিত হাত, পা, দেহকান্ড, হৃৎপিন্ড ও আন্ত্রিক পেশির সঞ্চালন ও স্বাভাবিক কাজকর্মের সক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে যে দুর্বিসহ জীবনের সূত্রপাত ঘটায় সেটি হচ্ছে **মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** নামে এ বংশগত রোগ। অসুখটি ছেলে শিশুদের বেশি হয়।

তিরিশের বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি দেখা যায়। এর মধ্যে ৯টি হচ্ছে প্রধান বাকিগুলো দুর্লভ। দেহের আক্রান্ত ও আশ-পাশের অংশ, পেশি দুর্বলতার ধরণ, কোন বয়সে দেখা দেয় এবং রোগের গতিধারা একেক রকম। রোগের সাধারণ শারীরিক লক্ষণগুলো হচ্ছে– পেশির দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাব; স্থূলতা দেখা দেওয়া; দ্রুত পেশিক্ষয়, দুর্বলতা ও পেশি অকার্যকর হওয়া; অস্থিসন্ধির কুঞ্চন; কপালের উপরে টাক হওয়া (frontal baldness); চোখে ছানি পড়া; চোখের পাতা ঝুঁকে পড়া; মানসিক অস্বাভাবিকতা; জননাঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতা প্রভৃতি।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিযুক্ত শিশুদের বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুদের মানসিক উঠা-নামা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তখন সব শিশুর জন্যই কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার দরকার পড়ে না। নিম্নোক্ত আচরণগত বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অভিভাবককে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে :

১. স্কুলে আচরণগত সমস্যা ও দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করায় সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকদের রিপোর্ট।
২. অবিভাবক বা সেবাদানকারীর উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়া।
৩. মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, হাঁটতে না চাওয়া।
৪. অসুখ সম্বন্ধে হতাশ ও আবেগতাড়িত হয়ে পড়া।
৫. ঘন ঘন বদমেজাজ দেখানো।
৬. ওষুধ খাওয়া বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপার প্রতিরোধ করা বা এড়িয়ে চলা এবং
৭. নিজের বয়সী শিশুদের কর্মকান্ডে অংশ না নেওয়া বা জমায়েতে শরীক না হওয়া।

মাসকুল্যার ডিস্ট্রফি একটি দুর্লভ জিনঘটিত অসুখ। আগেই বলা হয়েছে যে তিরিশেরও বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রয়েছে। এর মধ্যে **ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** (Duchenne Muscular Dystrophy সংক্ষেপে DMD) হচ্ছে ভয়াবহতম ডিস্ট্রফি। পঞ্চাশ হাজারে (৫০,০০০- এ) মাত্র একজনে এ রোগটি দেখা যেতে পারে। অন্য ডিস্ট্রফিগুলো আরও দুর্লভ। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফির সঙ্গে বোধশক্তিজনিত প্রতিক্রিয়ার সামান্য সম্পর্ক রয়েছে। কোনো শিশু যদি **অনুগ্র মানসিক প্রতিবন্ধী** (mild intellectual disable) বিশিষ্ট হয় এবং মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ভোগে তাহলে সে স্বাভাবিক মানুষের মতোই লেখা-পড়া ও চাকুরি করতে পারবে, এমনকি সাধারণ মানুষের মতো যানবাহনে চলাফেরাও করতে পারবে। **মাঝারি** (moderate) ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী হলে ওসব কাজে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কিন্তু **তীব্র** (very) মানসিক প্রতিবন্ধী বিশিষ্ট মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ভোগে এমন শিশু **অটিজম** (autism)-এর দিকে ধাবিত হতে পারে।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, জেনেটিক বিশৃঙ্খলজনিত এ রোগটির কোনো চিকিৎসা নেই। গবেষকরা মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি সৃষ্টিকারী **পরিব্যক্ত** (mutated) জিন সংশোধনের জন্য জেনেটিক থেরাপি আবিষ্কারের উদ্দেশে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। গবেষণার লক্ষ হচ্ছে অস্থিসন্ধির বিকৃতিরোধ করা, সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ানো এবং রোগীকে যন্ত্রণামুক্ত দীর্ঘায়ু করে তোলা। তবে বর্তমানে পেশির দুর্বলতা, আক্ষেপ, কাঠিন্য প্রভৃতি উপশমে বিভিন্ন ওষুধের প্রচলন রয়েছে (যেমন মেক্সিলেটিন, ব্যাকলোফেন, কার্বঅ্যামেজপাইন ইত্যাদি)।

X ক্রোমোজোমে অবস্থিত কোনো জিন যদি পরিব্যক্ত হয়ে অপত্য বংশে সঞ্চারিত হয় এবং রোগের প্রকাশ ঘটায় তবে সে ব্যক্তিকে X-লিংকড ব্যাধি নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষে যেহেতু একটিমাত্র X ক্রোমোজোম থাকে তাই এসব

রোগ-ব্যাধি কেবল পুরুষেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুরুষে আরেকটি X ক্রোমোজোমের পরিবর্তে যেহেতু Y ক্রোমোজোম থাকে তাই মাসুক্যুলার ডিস্ট্রফির জন্য দায়ী **ডিসট্রফিন জিন**-এর আর কপি থাকে না।

নারীদেহে দুটি X ক্রোমোজোম (XX) থাকে। অতএব একটি X ক্রোমোজোমের জিন বিকৃত হলে অন্য X ক্রোমোজোমে অবস্থিত স্বাভাবিক জিনটি **ব্যাকআপ কপি** হিসেবে কাজ করে। নারী পরিব্যক্ত X-লিংকড জিন বহন করলেও তার দেহে X-লিংকড রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাবে না, তবে ঐ নারী রোগের বাহক হিসেবে কাজ করবে এবং ওই জিন তার পুত্র-সন্তানে সঞ্চারিত করবে। প্রত্যেক পুত্র সন্তান অস্বাভাবিক এ জিন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার এবং রোগগ্রস্ত হওয়ার ৫০% সম্ভাবনা বহন করে। কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার সূত্রে বহন এবং রোগের বাহক হিসেবে ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা থাকবে ৫০%।

X ক্রোমোজোমে স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি (mutation)-র ফলে পুত্র সন্তানে X-লিংকড প্রচ্ছন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

মাসক্যুলার ডিসট্রফিতে জিনের ভূমিকা : দেহে প্রায় ৩ হাজার **পেশি-প্রোটিন** রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রোটিন একেকটি জিন-এ রক্ষিত থাকে। কিছু পেশি-প্রোটিন পেশিতন্তুর গাঠনিক অংশ, অন্যগুলো পেশিতন্তুতে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একটি পেশি-প্রোটিন জিনে সামান্য বিকৃতিও পেশিরোগের প্রকৃতি ও ভয়াবহতাকে প্রভাবিত করে। যেমন-**ডিসট্রফিন** প্রোটিন উৎপন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জিনে কিছু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার ফলে তীব্র পেশি-ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের অবস্থাকে **ডুসেনি মাসক্যুলার ডিসট্রফি** বলে। অন্য ক্ষেত্রে হয়তো রোগের অবস্থা তেমন ব্যাপক হয় না। আবার অন্যান্য ধরনের মাসক্যুলার ডিসট্রফিতে ডিসট্রফিন জিনে নয় বরং অন্যান্য জিনে মিউটেশন (পরিব্যক্তি) ঘটতে দেখা যায়।

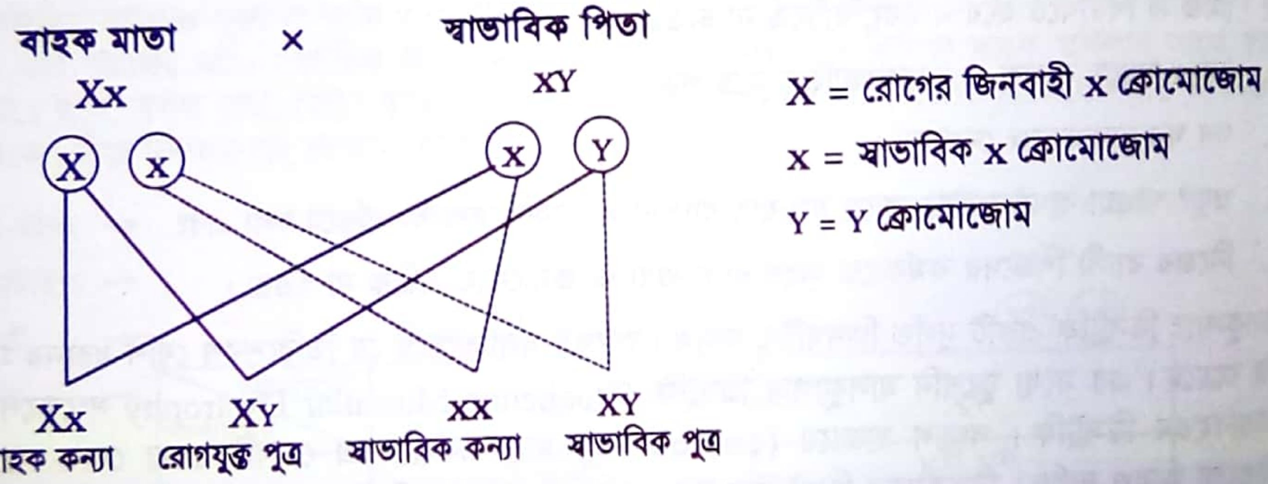

ABO ব্লাড গ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টর-এর কারণে সৃষ্ট সমস্যা
(ABO Blood Group and Problems due to Rh Factor)

ABO ব্লাড গ্রুপ

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে অবস্থিত বিভিন্ন অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে **ব্লাড গ্রুপ** বলে। অস্ট্রিয়ায় জন্ম গ্রহণকারী আমেরিকান জীববিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মনুষ্য রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন। রক্তকণিকায় কতকগুলো **অ্যান্টিজেন** (antigen)-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী ল্যান্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করেন, তা **ABO ব্লাড গ্রুপ** বা সংক্ষেপে **ব্লাড গ্রুপ** (blood group) নামে পরিচিত। অনেক সময় একে **ল্যান্ডস্টেইনার-এর ব্লাড গ্রুপ** (Landsteiner blood group)-ও বলে। বিজ্ঞানীদের প্রচন্ড আগ্রহের ফলে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আরও ১৩টি ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কৃত হয়।

মানুষের রক্তে A ও B-এই দুরকম অ্যান্টিজেন থাকতে পারে। অ্যান্টিজেন A ও B-র সাথে রক্তরসে কতকগুলো স্বতঃস্ফূর্ত অ্যান্টিবডি রয়েছে। এগুলোকে বলে a (বা anti-A) এবং b (anti-B)। এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়, যথা-A, B, AB ও O।

A ব্লাড গ্রুপে A অ্যান্টিজেন, B ব্লাড গ্রুপে B অ্যান্টিজেন এবং AB ব্লাড গ্রুপে A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে। O ব্লাড গ্রুপে রক্তের কণিকাঝিল্লিতে কোনো অ্যান্টিজেন নেই কিন্তু রক্তরসে a ও b দুরকম অ্যান্টিবডিই থাকে।

A-গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি B ব্লাড গ্রুপের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে, B গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না, কারণ সেখানে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। একই কারণে O গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য ৩টি গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। অর্থাৎ কারও দেহে O গ্রুপের রক্ত থাকলে তিনি **কেবল O গ্রুপের রক্ত নিতে পারবেন** কিন্তু দেওয়ার সময় **সব গ্রুপকেই রক্ত দিতে পারবেন**।

ABO ব্লাড গ্রুপের বৈশিষ্ট্য				
ব্লাড গ্রুপের নাম	**অ্যান্টিজেন**	**অ্যান্টিবডি**	**যাদেরকে রক্ত দান করতে পারে**	**যাদের রক্ত গ্রহণ করতে পারে**
ব্লাড গ্রুপ A (২৩%)	A	b	A ও AB	A ও O
ব্লাড গ্রুপ B (৩৫%)	B	a	B ও AB	B ও O
ব্লাড গ্রুপ AB (৮%)	A ও B	a বা b কোনটিই নেই	AB	A, B, AB ও O
ব্লাড গ্রুপ O (৩৪%)	কোন অ্যান্টিজেন নেই	a ও b উভয়ই আছে	A, B, AB ও O	O

[অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

Rh ফ্যাক্টর

১৯৪০ সালে **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** এবং **উইনার** (Karl Landsteiner and Wiener) **রেসাস** বানরের (*Macaca mulatta*) রক্ত খরগোসের শরীরে প্রবেশ করিয়ে খরগোসের রক্তরসে এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম হন। এ ফলাফল থেকে বিজ্ঞানী দুজন ধারণা করেন যে, মানুষের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত কণিকার ঝিল্লির মতো এক প্রকার অ্যান্টিজেন রয়েছে। রেসাস বানরের নাম অনুসারে ঐ অ্যান্টিজেনকে **রেসাস ফ্যাক্টর** (Rhesus factor) বা সংক্ষেপে **Rh factor** বলে।

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে **Rh ব্লাড গ্রুপ** বলে। Rh ফ্যাক্টরবিশিষ্ট রক্তকে **Rh^+** (Rh পজিটিভ) এবং Rh ফ্যাক্টরবিহীন রক্তকে **Rh^-** (Rh নেগেটিভ) রক্ত বলে।

বিজ্ঞানী Fisher মত প্রকাশ করেন যে, Rh ফ্যাক্টর মোট ৬টি সাধারণ অ্যান্টিজেনের সমষ্টিবিশেষ। এদের ৩ জোড়ায় ভাগ করা যায়, যেমন–C, c; D, d; E, e। এদের মধ্যে C, D, E হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রকট** এবং c, d, e হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রচ্ছন্ন**। মানুষের লোহিত কণিকায় একসংগে ৩টি অ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান কখনও একসাথে থাকে না, যেমন-CDE, CDe, cDE এমন সন্নিবেশ সম্ভব, CDd অসম্ভব। মেন্ডেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন (C, D, E) যে রক্তে থাকে তাকে Rh^+ রক্ত বলে। যে রক্তে মেন্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন অ্যান্টিজেন (c, d, e) থাকে তাকে Rh^- রক্ত বলে।

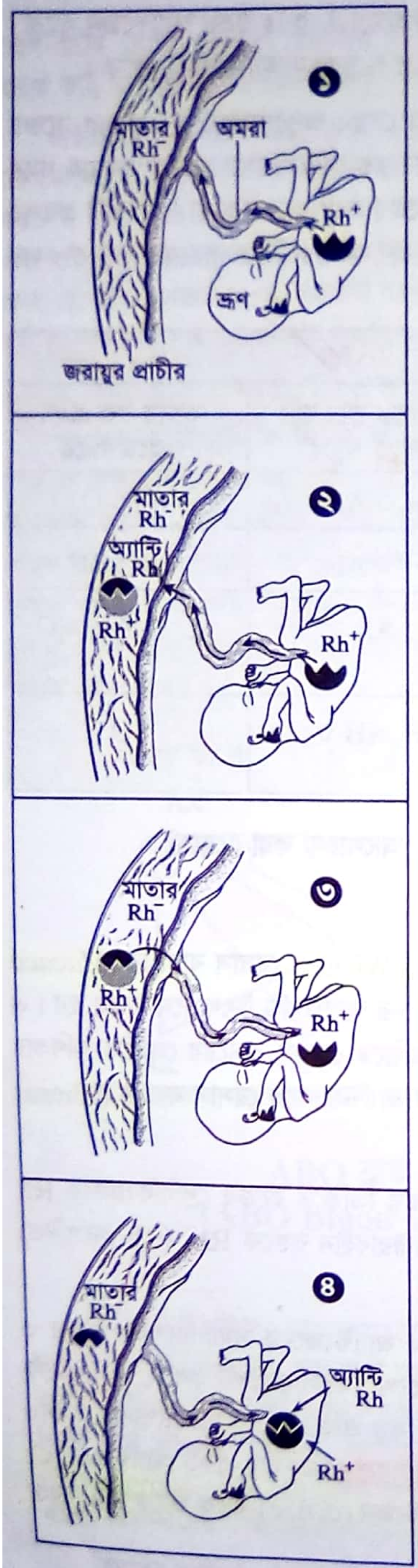

Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা (Problems due to Rh Factor)

১. রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা (Complexity in Blood Transfusion) : Rh^- রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির রক্তে Rh^+ বিশিষ্ট রক্ত দিলে প্রথমবার গ্রহীতার দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কিন্তু গ্রহীতার রক্তরসে ক্রমশ Rh^+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হবে। এই অ্যান্টিবডিকে **অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর** বলে।

গ্রহীতা যদি দ্বিতীয়বার দাতার Rh^+ রক্ত গ্রহণ করে তা হলে গ্রহীতার রক্তরসের অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টরের প্রভাবে দাতার লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে পিন্ডে পরিণত হবে। তবে একবার সঞ্চারণের পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে তা হলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

২. গর্ভধারণজনিত জটিলতা (Complexity in Pregnancy): সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন Rh^- (Rh নেগেটিভ) মহিলার সঙ্গে Rh^+ (Rh পজিটিভ) পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান হবে Rh^+, কারণ Rh^+ একটি প্রকট বিশিষ্ট্য। ভূণ অবস্থায় সন্তানের Rh^+ ফ্যাক্টরযুক্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে এসে পৌছাবে, ফলে মায়ের রক্ত Rh^- হওয়ায় তার রক্তরসে **অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর** (অ্যান্টিবডি) উৎপন্ন হবে।

অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর মায়ের রক্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করলে ভূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে, ভূণও বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে। এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচন্ড রক্তাল্পতা এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থাকে **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস** (erythroblastosis foetalis) বলে।

যেহেতু Rh বিরোধী অ্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় তাই প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সুস্থই জন্মায়। কিন্তু পরবর্তী গর্ভাধান থেকে বিপত্তি শুরু হয় এবং ভূণ এ রোগে ভুগে মারা যায়। তাই বিয়ের আগে হবু বর-কনের রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং একই Rh ফ্যাক্টরভুক্ত (হয় Rh^+ নয়তো, Rh^-) দম্পতি হওয়া উচিত। তবে সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ অংশে Rh^- বৈশিষ্ট্য দুর্লভ।

কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ককেশিয়ানদের ১৫% Rh^- বৈশিষ্ট্য বহন করে। তবে যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তারা হচ্ছে পাইরেনীজ-এর বাস্ক (২৫–৩৫%), আফ্রিকার বার্বার এবং সাইনাই-উপদ্বীপের বেদুইন (১৮–৩০%)।

১১.২ : বিবর্তন বা অভিব্যক্তি (Evolution)

বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা (The concept of Evolution)

মন্থর গতিসম্পন্ন ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলদেহী জীব থেকে জটিল জীবের আবির্ভাবকে বিবর্তন বলে। বিবর্তনের ইংরেজী Evolution শব্দটি প্রকৃত পক্ষে ল্যাটিন শব্দ "*evolvere*" অর্থ **বিকশিত হওয়া** বা **ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হওয়া** শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

জীবজগতে যে বিবর্তন ঘটছে এ প্রত্যয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে বহু আগেই। কিন্তু ঠিক কীভাবে বিবর্তন হচ্ছে এ ব্যাপারে কেউ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। এ মতানৈক্যের মূল কারণ হলো বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া যা সহজে অনুধাবন ও অবলোকন করা যায় না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কয়েকজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক তাঁদের লেখায় বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু কাল্পনিক ধারণা রেখে গেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে বিবর্তনের ফলেই নতুন নতুন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনের ধারণা আধুনিককালের হলেও দেখা যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। **এম্পেডোক্লিস** (Empedocles, 495–435 B.C)-কে **বিবর্তনের জনক** বলে অভিহিত করা হয়। যোগ্যতমের আকস্মিক সৃষ্টি এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি সম্বন্ধে তিনি জোড়ালো ধারণা পোষণ করতেন। **ডেমোক্রিটাস** (Democritus, 460–357 B.C.) এ ধারণা পোষণ করতেন যে শরীরের যে কোন অঙ্গ পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়। বিখ্যাত দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 384-322 B.C)-এর মনেও এ ধারণা জন্মেছিল যে নিম্নস্তরের জীব কতকগুলো ধারাবাহিক নিয়মের মধ্য দিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। অ্যারিস্টটলের পরে ফরাসি বিজ্ঞানী **বুফন** (Buffon, 1707-1788) মত প্রকাশ করেন যে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবেরও পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবেশের প্রভাবে প্রথমে জীবদেহে সামান্য আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং পরে ঐ পরিবর্তন বহুকাল ধরে বংশানুক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমে বড় রকমের প্রভেদ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে কয়েকজন বিজ্ঞানী উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ [illegible]নের কলা-কৌশল সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করেন। এগুলোর মধ্যে ফরাসি প্রকৃতিবিদ **জ্যা ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক**, ইংরেজ [illegible]বিদ **চালর্স ডারউইন**, ডাচ বিজ্ঞানী **ডে ভ্রিস** (de Vries), জার্মান বিজ্ঞানী **আগস্ট ভাইজম্যান**-এর মতবাদ ও [illegible] মতবাদই প্রধান।

বিবর্তনের মতবাদসমূহ (Theories of Evolution)

বিবর্তনের বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়ার পর দ্বিতীয় যে প্রাসঙ্গিক বিষয় এসে পড়ে তা হচ্ছে বিবর্তনের **পদ্ধতি** অর্থাৎ **কীভাবে বিবর্তন ঘটে**। এ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক **মতবাদ** প্রচলিত হয়েছে। নিচে জৈব বিবর্তনের প্রধান দুটি মতবাদ, **ল্যার্মাকবাদ** ও **ডারউইনবাদ** এবং **নব্য-ডারউইনবাদ** সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কবাদ বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ (Lamarckism or Theory of Inheritance of Acquired Characters)

J.B. Lamarck

ল্যামার্ক একজন ফরাসী দার্শনিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম **জাঁ বাপ্তিস্ট পিয়েরে এন্টোইনে দ্য মনেট শেফালিয়ের দ্য ল্যামার্ক** (Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. 1744-1829)। প্রথমে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, তারপর উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে প্রাণীর উপর গবেষণা করেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন। তিনি **বায়োলজি** (Biology) শব্দের প্রবর্তক এবং প্রাণিজগতকে **মেরুদণ্ডী** ও **অমেরুদণ্ডী** এ দুভাগে বিভক্ত করেন। একটি সুসংগঠিত জৈব বিবর্তনবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে ল্যামার্ক সুপরিচিত। তাঁর মতবাদটি, **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ** নামে অভিহিত।

ল্যামার্ক-এর সূত্রসমূহ

ডডসন (Dodson) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিবর্তন সম্বন্ধে ল্যামার্ক-এর বিস্তৃত ধারণাকে ৪টি সূত্রের অধীন করে ব্যাখ্যার সুবিধা করে দেন। নিচে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রথম সূত্র-**বৃদ্ধি** : প্রত্যেক জীব তার জীবনকালে অন্তঃজীবনী শক্তির প্রভাবে দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটাতে চায়।

খ. দ্বিতীয় সূত্র-**পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন** : সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনের জন্য সৃষ্ট অভাববোধের উদ্দীপনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে দেহের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে।

গ. তৃতীয় সূত্র-**ব্যবহার ও অব্যবহার** : ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দেহের একটি বিশেষ অঙ্গ সুগঠিত, কার্যক্ষম ও বড় হতে পারে, আবার অব্যবহারে অঙ্গটি ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঘ. চতুর্থ সূত্র-**অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার** : প্রতিটি জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরে সঞ্চারিত হয়।

ল্যামার্ক-এর সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা

ক. বৃদ্ধি : জীবের জীবদ্দশায় অন্তঃজীবনী-শক্তির প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়েরই বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ লক্ষ করলেও এ সত্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন-Cnidaria থেকে Chordata পর্যন্ত প্রাণিগোষ্ঠির প্রত্যেক ধাপেই দেখা যায় দেহাকৃতি বৃদ্ধির একটি সাধারণ প্রবণতা।

খ. পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন : পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য যে অভাববোধের সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয় বা অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।

ল্যামার্ক মনে করতেন, পরিবেশ উদ্ভিদকে সরাসরি প্রভাবিত করে ফলে নতুন পরিবেশে দেখা দেয় উদ্ভিদের নতুন অঙ্গ। প্রাণীর বেলায় পরিবেশ প্রাণিদের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত করে, তখন প্রাণী যা চায় তাই-পায়। যেমন-জিরাফের স্নায়ুতন্ত্রই তাকে বাধ্য করেছে ঘাড় উঁচু করে গাছের পাতা খাওয়ার জন্য।

চিত্র ১১.২.২ : জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার ল্যামার্কীয় ব্যাখ্যা

গ. ব্যবহার ও অব্যবহার : পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য নতুন সৃষ্ট বা পরিবর্তিত অঙ্গটি যদি জীবদ্দশার পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয় তা হলে তা সুগঠিত, কার্যক্ষম ও বড় হবে। অন্যদিকে, জীবদ্দশার পরবর্তী সময়ে অঙ্গটির অব্যবহারে তা ক্রমশ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ছোট হতে থাকে, অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিচে ব্যবহার ও অব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হলো।

ব্যবহার : (i) জিরাফের আদি পুরুষের গলা ও সামনের পা দুটি এখনকার ঘোড়ার মত খাটো ছিল এবং এরা ঘাস বা ছোট ছোট গাছ আহার করতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে চারণভূমির অভাব ঘটলে এরা গাছের উঁচু শাখা-প্রশাখার পাতা খেতে শুরু করে। উঁচু ডাল-পালা থেকে পাতা খাওয়ার জন্য সৃষ্ট ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গলার দৈর্ঘ্য বংশ পরম্পরায় একটু করে বাড়তে থাকে। এভাবে খাটো গ্রীবাধারী পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান যুগের লম্বা গ্রীবাধারী জিরাফের উদ্ভব ঘটেছে। (ii) হাঁস, পেলিকান, হাড়গিল্লা প্রভৃতি পাখি আদিকালে স্থলচর ছিল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য পানিতে সাঁতারের প্রয়োজনে পায়ের অধিক ব্যবহারের ফলে পায়ের আঙুলের গোড়া থেকে চামড়া বৃদ্ধি পেয়ে লিপ্তপদ (webbeed feet বিশিষ্ট পাখির উদ্ভব ঘটায়।

অব্যবহার : (i) উটপাখির পূর্ব পুরুষেরা আগে উড়তে পারত। কিন্তু ওদের ডানাদুটি ক্রমাগত অব্যাহারের ফলে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে। (ii) মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে কক্কিক্স (coccyx)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

ঘ. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার : প্রতিটি জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরে সঞ্চারিত হবে। এভাবে, বংশ পরম্পরায় পরিবর্তিত চরিত্র সঞ্চারিত হতে থাকে এবং নতুন নতুন পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে থাকে। ফলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি প্রজাতির সদস্যদের সাথে এদের পূর্ব পুরুষের আর তেমন মিল থাকে না। এভাবেই উদ্ভব ঘটে এক **নতুন প্রজাতির**।

ল্যামার্কিজমের সমালোচনা

ল্যামার্কের সমকালীন অনেকে সাময়িক স্বীকৃতি দিলেও এ মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে অনেক কারণে সমর্থনযোগ্য হয়নি, যেমন: ল্যামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার তত্ত্বটি সত্য নয়; কারণ, শিরা ও ধমনি ক্রমাগত ব্যবহৃত হলেও এদের আকার ও আয়তন কখনো বৃদ্ধি পায় না; বারংবার ব্যবহারের ফলে কোন অঙ্গের বৃদ্ধি হয়ত হতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কোন অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অবলুপ্তির ঘটনাও বিরল নয়; অর্জিত গুণের বংশানুক্রম সমর্থনযোগ্য নয়। লেজ কাটা কুকুরের বাচ্চা জন্মসূত্রে কখনই লেজবিহীন হয় না; অভাব বোধ ও প্রয়োজনের তাগিদে অঙ্গ সৃষ্টির ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। আকাশে উড়বার আকাঙ্খায় কোন মানুষের মনে পাখির মত ডানার জন্য অভাব বোধ মানুষের দেহে কখনো ডানা গজাবে না; ইন্দ্রিয় সৃষ্টির পূর্বে কোন ইন্দ্রিয়ের জন্য অভাব অনুভূত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না; ল্যামার্ক ধারণা করতেন ক্রিয়ার ফলেই কোন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অঙ্গ না থাকলে তার ক্রিয়ার প্রশ্ন অবান্তর।

ডারউইনিজম বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ
(Darwinism or Theory of Natural Selection)

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯–১৮৮২) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (naturalist) ছিলেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত "Origin of Species By Means of Natural Selection" নামক গ্রন্থে তিনি অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও জোরালো মতবাদ প্রকাশ করেন। এ মতবাদ **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ** বা **ডারউইনিজম** নামে পরিচিত। এ মতবাদের মাধ্যমে তিনি অভিব্যক্তির কলাকৌশল ও প্রবাহ সম্পর্কে বাস্তব তথ্যাবলী প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি উদ্ভিদ, প্রবাল, মানুষের উদ্ভব, আগ্নেয়গিরির ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণমূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

আধুনিক চিন্তা জগতের অন্যতম মহাস্থপতি ছিলেন **চার্লস রবার্ট ডারউইন** (Charles Robert Darwin)। তিনিই সর্বপ্রথম আপন অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে বিবর্তনের ঘটনাবলিকে যুক্তিনিষ্ঠ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন।

১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর **এইচ. এম. এস. বিগল** (Her Majestic Service Beagle) নৌজাহাজের একজন অবৈতনিক প্রকৃতিবিদ হিসেবে **দক্ষিণ আটলান্টিক** এবং **প্রশান্ত মহাসাগর** ...র সাথে ইংল্যান্ডের ...র্ট (Devenport) থেকে ... করেন। ...টাগোনিয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, ...পাস দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট জাগো ...জল, তাহিতি থেকে অস্ট্রেলিয়া ...উজিল্যান্ড হয়ে ভারত মহাসাগর ...উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ ...র পর বিগল ইংল্যান্ডে ফিরে আসে। ...এ সমুদ্র ভ্রমণে ডারউইন অসংখ্য জীবাশ্ম, খনিজ পদার্থ ও পাথর সংগ্রহ করেন।

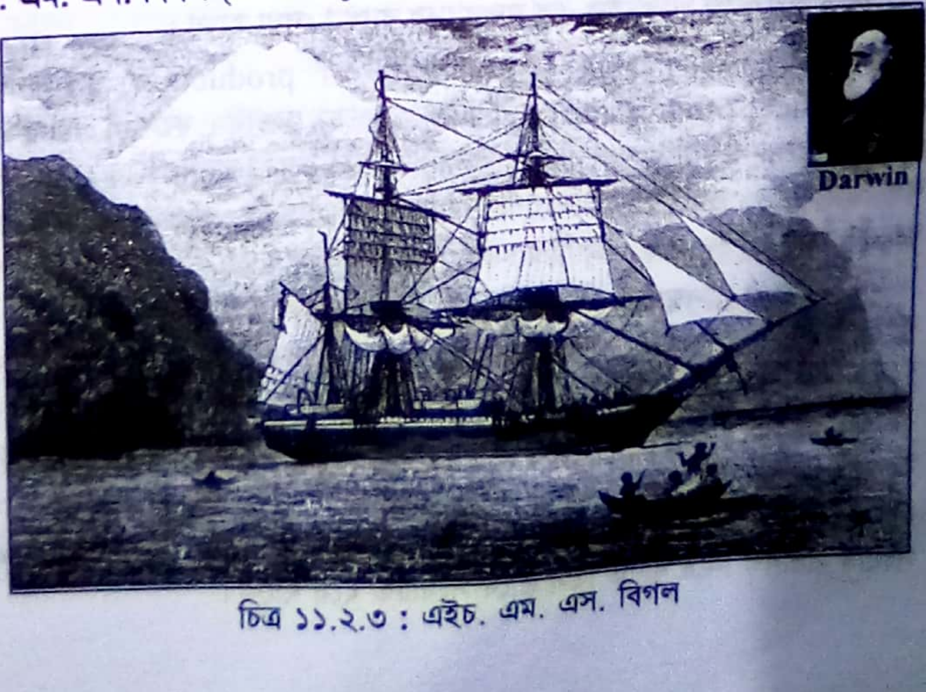

চিত্র ১১.২.৩ : এইচ. এম. এস. বিগল

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি কয়েক খন্ড বই রচনা করেন। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি প্রজাতি উৎপত্তির সমস্যা-ঘটিত হাজারো প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রজাতি উদ্ভবের খসড়া রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ ও প্রমাণাদিসহ ১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" শিরোনামে ডারউইনের বিশ্ব কাঁপানো, যুগান্ত সৃষ্টিকারী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে ডারউইন মারা যান। ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ডারউইনবাদ বা ডারউইনিজম (Darwinism)

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে **ডারউইন** ও **ওয়ালেস** (Wallace) জৈব বিবর্তন সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাই পরবর্তীতে **ডারউইনবাদ** নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ মতবাদের ভিত্তি দুটি; যথা- (১) জীবজগতের কতগুলো বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং (২) এ বাস্তব ঘটনাবলীর ফলাফল প্রকাশ। ভিত্তিমূল-দুটির উপর প্রতিষ্ঠিত ডারউইনবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ৬টি ধাপে ভাগ করেছে। প্রত্যেক জীব ঐ ধাপগুলো অতিক্রম করেই একেকটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। সর্বশেষ ধাপটির বক্তব্য অনুযায়ী ডারউইনবাদকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ** বলা হয়, কারণ **প্রজাতি উদ্ভবের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকৃতিই নির্বাচন করে থাকে কারা টিকে থাকতে সমর্থ বা অসমর্থ।**

নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে প্রয়োগযোগ্য ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ কয়েকটি পৃথক ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পারস্পরিক সম্পর্কের সার্থক সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। নিচের ছকে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরা হলো।

ঘটনা প্রবাহ	সিদ্ধান্ত
১. বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of production) ২. খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food and space)	**জীবন সংগ্রাম**
৩. জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) ৪. পরিবৃত্তির অসীম ক্ষমতা (Omnipotence of variation amongst the individual)	**যোগ্যতমের জয়**
৫. যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) ৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)	**নতুন প্রজাতির উৎপত্তি**

নিচে সংক্ষেপে ডারউইন-এর মতবাদের ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of production) : প্রাণী-উদ্ভিদ নির্বিশেষে **জ্যামিতিক হারে** (geometrical progression) বংশবৃদ্ধির প্রবণতা দেখায়। ফলে বাঁচার সম্ভাবনা সম্পন্ন জীবের সংখ্যার চেয়ে জন্ম নেওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় বহুগুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ-একটি **স্যামন মাছ** (Salmon fish) এক ঋতুতেই দুই কোটি আশি লক্ষ ডিম পাড়ে। সমস্ত ডিম যদি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় এবং অনুরূপভাবে ডিম পাড়ে তবে, পৃথিবীর জলভাগ কয়েক বছরের মধ্যে কেবল এক প্রজাতির প্রাণী দিয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।

২. খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food & space) : প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুর উৎপাদন হার এবং ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমিত। এ অবস্থায় জীবের জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধির ফলে এদের ভিতর পর্যাপ্ত আহার ও যোগ্য বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থাৎ এরা প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হবে।

৩. জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) : ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক বাধা কার্যকর হয় জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে। একদিকে ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি অন্যদিকে পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়। এতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত জীব বাছাই হয়ে যায়। এটিই **জীবন সংগ্রাম** বা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। জীবন সংগ্রাম প্রধানত নিচে বর্ণিত তিন ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ক. **অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম** (Intra-specific struggle) : একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের খাদ্য ও বাসস্থান একই রকম হওয়ায় এদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একেই **অন্তঃপ্রজাতিক** বা **স্বপ্রজাতির সঙ্গে সংগ্রাম** বলা হয়। যেমন– বট গাছের নিচে লক্ষ লক্ষ বীজ পতিত হলেও এ গাছের নিচে সাধারণত বটের চারা দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা এত বিপুল সংখ্যক বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান গাছ তলায় স্বল্প স্থানে থাকেনা। বরং অতিস্বল্প সংখ্যক বীজ পাখি ও অন্য মাধ্যম দ্বারা বাহিত হয়ে কোনো ফাঁকা জায়গায় পতিত হলে সেখানে চারা গজায় ও পরিণতি লাভ করে। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি দ্বীপে নির্দিষ্ট প্রজাতির তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় এরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সবল প্রাণিগুলো দুর্বল প্রাণিদের প্রতিহত করে, ফলে দুর্বল প্রাণিগুলো কিছু দিনের মধ্যেই অনাহারে মারা যায়।

খ. **আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম** (Inter-specific struggle) : যে কোন দুটি বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে বাঁচার জন্য যে প্রতিযোগিতা ঘটে তাকেই **আন্তঃপ্রজাতিক** বা **বিষম প্রজাতির সঙ্গে সংগ্রাম** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ব্যাঙ একদিকে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে অন্যদিকে এরা সাপ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার ময়ূর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ উভয়েই ভক্ষিত হয়। এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে **খাদ্য-খাদক** সম্পর্কযুক্ত একটি নিষ্ঠুর কিন্তু বাস্তব জীবন সংগ্রাম গড়ে উঠে।

গ. **পরিবেশগত সংগ্রাম** (Environmental struggle) : জীব যে পরিবেশে বাস করে সেখানে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তা থেকে রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম তাকে **পরিবেশগত সংগ্রাম** বলে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, অধিক তাপ ও শৈত্য, মহামারী, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় জীবকূলকে ব্যাপক ক্ষতি করে। বরফ যুগের কবলে পড়ে ডাইনোসরসহ অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

৪. **সার্বজনীন পরিবৃত্তি** বা **প্রকরণের উপস্থিতি** (Universal occurrence of variations) : বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে ...ন দুটি জীবই হুবহু একরকম নয়। এমনকি একই পিতামাতার সন্তানাদির মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও তারা কখনই এক রকম নয়, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। আর এই পার্থক্যগুলোই **পরিবৃত্তি** বা **প্রকরণ** নামে ...চিত। ডারউইন মনে করতেন যে, জীবন সংগ্রামের ফলে জীবদেহে যে পরিবৃত্তি ঘটে তা বংশগতির মাধ্যমে ...রিত হয়। পরিবৃত্তি দুধরনের : যথা–**ধারাবাহিক পরিবৃত্তি** এবং **অধারাবাহিক পরিবৃত্তি**। ধারাবাহিক পরিবৃত্তিতে ...এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজিত হয়ে ক্রমে ক্রমে ...প্রাপ্ত হয় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টির লক্ষে অগ্রসর হয়। তাই ডারউইন পরিবৃত্তি বা প্রকরণকে বিবর্তনের ক্ষেত্রে ...াজনীয় কাঁচামাল হিসেবে বিবেচনা করেন। অধারাবাহিক পরিবৃত্তি আকস্মিক, অনিয়মিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ...তিকর। কাজেই, প্রজাতি সৃষ্টির ব্যাপারে এ প্রকরণের তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

৫. **যোগ্যতমের উদ্বর্তন** (Survival of the fittest) : জীবন সংগ্রামে যে জীব যোগ্য ও অনুকূল প্রকরণ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে শুধু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। পক্ষান্তরে জীবন সংগ্রামে যে অযোগ্য সে নিশ্চিহ্ন হয়ে ...রে। তাই দেখা যায় যে, অনুকূল প্রকরণের ফলে জীব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়। প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশ সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হলে সেজীব জীবন সংগ্রামে টিকে যায়। ...সব জীবে সুবিধাজনক/অনুকূল প্রকরণ ঘটে না সেগুলো ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে।

৬. **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) : যে সব জীবের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি আছে প্রকৃতি তাদের নির্বাচন ও লালন করে। সুবিধাজনক পরিবৃত্তিধারী জীব পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। এদের বংশধরদের মধ্যে পরিবৃত্তিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবাহিত হয়। যাদের ...বিধাজনক পরিবৃত্তি বেশি থাকে প্রকৃতি পুনরায় তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত ...য়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের **নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।**

ডারউইনবাদ-এর সমালোচনা (Criticism of Darwinism)

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও সাড়া জাগানো অবদান। বিশ্বব্যাপী সমর্থিত হলেও মতবাদটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। কারণ এ মতবাদে যেমন কতকগুলো যৌক্তিক ও প্রশংসনীয় দিক আছে তেমন কতকগুলো অযৌক্তিক দিকও রয়েছে। নিচে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দিকগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যৌক্তিক দিক বা সফলতা

১. ডারউইনবাদের মূল বক্তব্যগুলো (যেমন–বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি) অনেকাংশেই বাস্তব।
২. বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অদ্যাবধি যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ডারউইনবাদের সমর্থক।
৩. অতীতের অনেক বৃহদাকার জীব জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
৪. অভিযোজনে ব্যর্থ বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ডারউইনবাদকে সমর্থন যোগায়।
৫. প্রকৃতিতে একই প্রজাতির দুটি জীব হুবহু একরূপ নয়। এটিই প্রকৃতিতে প্রকরণের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

অযৌক্তিক দিক বা দুর্বলতা

১. জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা বলা হলেও, কিন্তু কিভাবে উপযুক্ত প্রকরণের উদ্ভব হয় সেকথা বলা হয়নি।
২. জীবজগতের সব নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন নয়।
৩. প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে অপারগ।
৪. ডারউইন যে কোন ধরনের প্রকরণ বা পরিবৃত্তিকে বংশগত বলে মনে করতেন। কিন্তু আমরা জানি কেবল জননকোষে সংঘটিত প্রকরণগুলোই বংশানুসরণযোগ্য।
৫. একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। পরিব্যাপ্তি মতবাদ দেন ভ্রিস।

নব্য-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism)

ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেড়শ বছরের অধিক অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে জীবন বিজ্ঞানের গবেষণায় অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মিলেছে। বিশেষ করে বিগত শতাব্দীতে জিন, ক্রোমোজোম ও মিউটেশন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক পর্যায়ে **ভাইজম্যান** (August Weismann) ও তাঁর অনুগামীরা ডারউইনের মতবাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে নতুন জ্ঞানের আলোকে সবল করে তোলেন। ভাইজম্যান ও তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের এ নব্যমূল্যায়নকে **নব্য-ডারউইনবাদ** বলা হয়।

ভাইজম্যানের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জীবদেহে পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বাহ্য প্রভাব বংশানুসৃত হয় না। তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইঁদুর ছানার লেজ কেটে কোনো প্রজন্মে ছানার লেজের দৈর্ঘ্য কমতে দেখেননি। ১৮৯৬ সালে তিনি তাঁর **জার্মপ্লাজম-সোমাটোপ্লাজম** (Germplasm-Somatoplasm) তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে জীবের জননাঙ্গে অবস্থিত জননকোষে থাকে **জার্মপ্লাজম,** আর দেহের অবশিষ্ট কোষে (somatic cell) থাকে **সোমাটোপ্লাজম**। পরিবেশের প্রভাবে সোমাটোপ্লাজমে পরিবর্তন ঘটলেও জার্মপ্লাজমে কোন পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে। তাই কেবল সোমাটোপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তন বংশগতি লাভে সমর্থ হয় না। সুতরাং পরিবেশের সব প্রত্যক্ষ প্রভাবই বিবর্তনের শর্ত হতে পারে না।

নব্য-ডারউইনবাদীদের মধ্যে ভাইজম্যান ছাড়া **হাক্সলি** (T.H. Huxley), **স্পেনসার** (H. Spencer), **জর্ডান** (B.S. Jordan), **গ্রে** (Asa Gray) এবং **হেকেল** (E. Haeckel) এর নাম উল্লেখযোগ্য। নব্য-ডারউইনবাদ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে–

১. প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে পপুলেশন পর্যায়ে।
২. অভিযোজনের কারণ একাধিক, প্রাকৃতিক নির্বাচন এদের মধ্যে একটি।
৩. প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে জীবের জার্মপ্লাজম স্তরে। আর জার্মপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তনই বংশগতি লাভে সমর্থন হয়।
৪. জার্মপ্লাজম তত্ত্বের আলোকে কেবলমাত্র গোনাড থেকে জননকোষে জেনেটিক বস্তু গঠিত হয়।
৫. এ মতবাদের প্রকরণের ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হয় যে জনন কোষে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার ফলেই পরিবর্তি বংশধরে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে, এর ফলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

বিবর্তনের ধাপ ৩টি : মাইক্রো, ম্যাক্রো, মেগা

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ (Evidences of Evolution)

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণগুলো একত্র করলে কারও পক্ষে এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি তৈরি বা উত্থাপন করা সম্ভব হবে না। হয়তো কোনো ক্ষেত্রে কিছু প্রমাণ পাওয়া বাকি রয়েছে। সে স্থানটুকু কল্পনামিশ্রিত চিন্তা ধারায় কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে যাওয়া উপন্যাসের মত মূল বক্তব্যটি কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আলোচনার সুবিধার্থে বিবর্তনের প্রমাণগুলোকে নিম্নোক্ত শাখাসমূহে ভাগ করা হয়েছে।

বিবর্তন ৩ ধরনের – অপসারি, অভিসারি, সমান্তরাল

বিবর্তনের প্রমাণসমূহ হলো –

১. **অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ,** ২. **ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ,** ৩. **জীবাশ্মগত প্রমাণ,** ৪. **শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ,** ৫. **শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ,** ৬. **কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ,** ৭. **জিনতত্ত্বীয় প্রমাণ** এবং ৮. **ভৌগোলিক প্রমাণ।**

১. অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ (Morphological Evidences)

জীববিজ্ঞানের যে শোখায় জীবের গঠন ও আকৃতি (বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ) সম্বন্ধে আলোচিত হয় তাকে **অঙ্গসংস্থান** (morphology) বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাহ্যিক ও অন্তর্গঠন পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট মনে হবে নিম্নশ্রেণির প্রাণী থেকে উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহে অঙ্গসংস্থানজনিত জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবর্তনের স্বপক্ষে অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়।

ক. তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy)

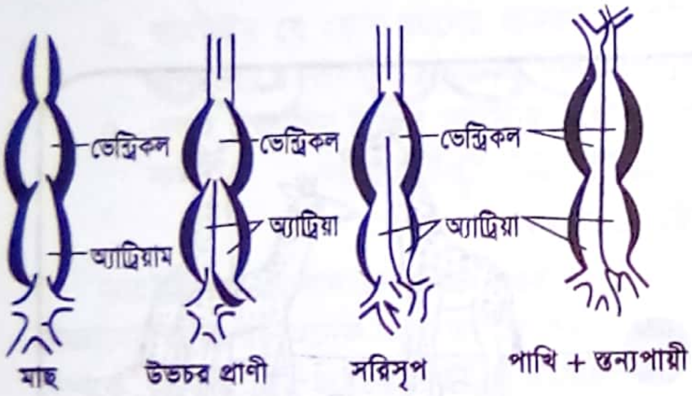

চিত্র ১১.২.৫ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

❑ **মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ :** বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠনের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাছে **দুইপ্রকোষ্ঠ**-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড, উভচরে **তিনপ্রকোষ্ঠ**-বিশিষ্ট, সরিসৃপে আংশিক **চারপ্রকোষ্ঠ**-বিশিষ্ট হলেও পাখি ও স্তন্যপায়ীতে **সম্পূর্ণ চারপ্রকোষ্ঠ**-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড রয়েছে।

❑ **মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক :** বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাছ থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। বিবর্তনের সোপানে যতই উপর দিকে উঠা যায়, ততই অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের মূল কাঠামোটির ক্রমিক জটিলতা দেখা যায়, বিশেষ করে **সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (cerebral hemisphere) এবং **সেরেবেলাম** (cerebellum)-এর।

খ. সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous organs) ও সমবৃত্তি অঙ্গ (Analogous organs)

যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তি এক সেসব অঙ্গকে **সমসংস্থ অঙ্গ** বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদ, যেমন-পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, সীল এর ফ্লিপার, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ। এসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠন একই রকম। বাহ্যিক বিভিন্নতার জন্য আপাতদৃষ্টিতে এসব অঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হলেও অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে বলা যায়, এগুলো মূলত পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট (pentadactyle) অগ্রপদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অগ্রপদে যেসব অস্থি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে সেগুলো হচ্ছে হিউমেরাস, রেডিয়াস ও আলনা, কারপাল, মেটাকারপাল ও ফ্যালাঞ্জেস। উল্লিখিত প্রাণিদের অগ্রপদে এসব অস্থি পর্যায়ক্রমে পাওয়া যায়। উড়ার সুবিধার জন্য বাদুড়ের অগ্রপদের চারটি আঙ্গুল খুব লম্বা হয়ে ডানায় পরিণত হয়েছে। পানিতে সাঁতারের জন্য

চিত্র ১১.২.৬ : সমসংস্থ অঙ্গ

সীলের অগ্রপদের অস্থিগুলো খাটো ও চওড়া হয়ে বৈঠার মতো হয়েছে। দৌড়ানোর সুধার জন্য ঘোড়ার অগ্রপদের রেডিয়াস ও আলনা একীভূত হয়েছে এবং ফ্যালাঞ্জেসের মাঝের তিনটি অঙ্গুলি কার্যকরী ক্ষুরে পরিণত হয়েছে। পাখির অগ্রপদ ডানায়, এবং মানুষের অগ্রপদ বিভিন্ন কাজ করার উপযোগী পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট হাতে পরিণত হয়েছে। আকার আকৃতির যতোই পার্থক্য থাকুক না কেন সমসংস্থ অঙ্গগুলোর নিরীক্ষা করলে দেখা যায় এগুলোর গাঠনিক মৌলিক ভিত্তি একই। কাজেই সমসংস্থ অঙ্গগুলো নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। অতএব বলা যায়, এসব প্রাণিগোষ্ঠি একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং বিভিন্ন ধারায় বিবর্তনের জন্য এসব অঙ্গের মধ্যে আপাত পার্থক্য দেখা যায়। যেসব অঙ্গ গঠনগত দিক থেকে আলাদা কিন্তু কাজের দিক থেকে এক সেগুলোকে **সমবৃত্তীয় অঙ্গ** বলে। যেমন- পাখির ডানা, প্রজাপতির ডানা। পাখি ও প্রজাপতির ডানা নিরীক্ষায় দেখা যায়, এরা ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায়, ডানার কাজও এক কিন্তু এদের গঠন ও পরিস্ফুটনে কোনো মিল নেই। অতএব, এক্ষেত্রে সমবৃত্তীয় অঙ্গের বাহকদের মধ্যে জাতিতাত্ত্বিক কোনো সম্পর্ক নেই।

গ. নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহ (Vestigeal organs)

প্রচলিত ধারণায়, যে সব অঙ্গ একসময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল, কিন্তু পরবর্তী বংশধরের দেহে গুরুত্বহীন, অগঠিত এবং অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ** বলে। মানবদেহে শতাধিক নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন (i) চোখের ভিতরের দিকের কোণায় **উপপল্লব** (nictitating membrane), (ii) **আক্কেল দাঁত**সহ কয়েক ধরনের দাঁত; (iii) গায়ের **লোম**; (iv) বহিঃকর্ণের তিনটি করে **কর্ণপেশি**; (v) লেজ না থাকলেও **পুচ্ছাস্থি**; (vi) বৃহদান্ত্রের সাথে যুক্ত **অ্যাপেন্ডিক্স** ইত্যাদি। বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এগুলোর সক্রিয় ভূমিকা এখনও দেখা যায়। গরু কান নাড়াতে পারে কিন্তু মানুষ তা পারে না। মানুষের লেজের কশেরুকাগুলো একত্রিত হয়ে ছোট অস্থি পিণ্ড বা **কক্কিক্স** হিসেবে মেরুদণ্ডের পশ্চাৎপ্রান্তে এখনও অবস্থান করে। পরিবেশগত কারণে মানুষে এসব অঙ্গ করে প্রয়োজনে না আসায় বিবর্তনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে।

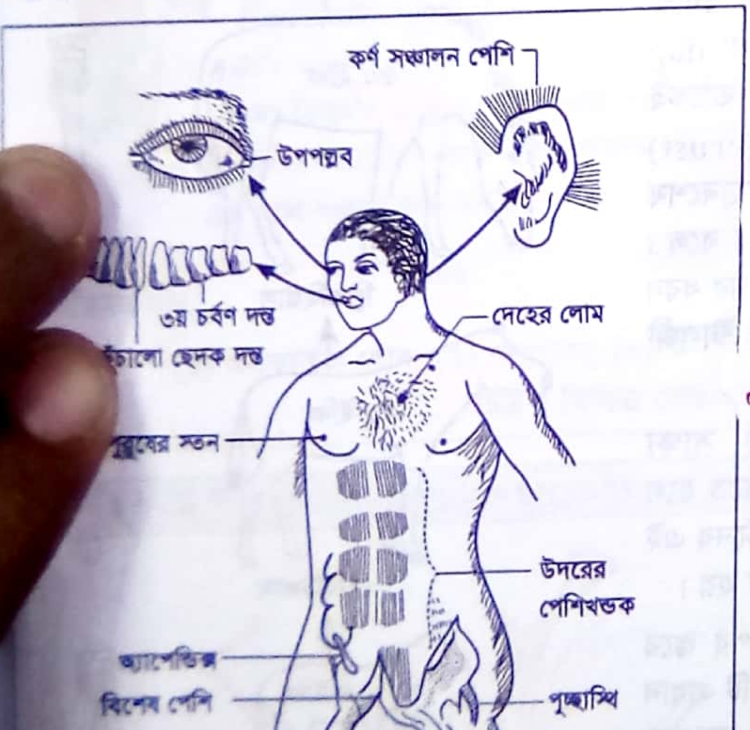

চিত্র ১১.২.৭ : মানুষের কয়েকটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ

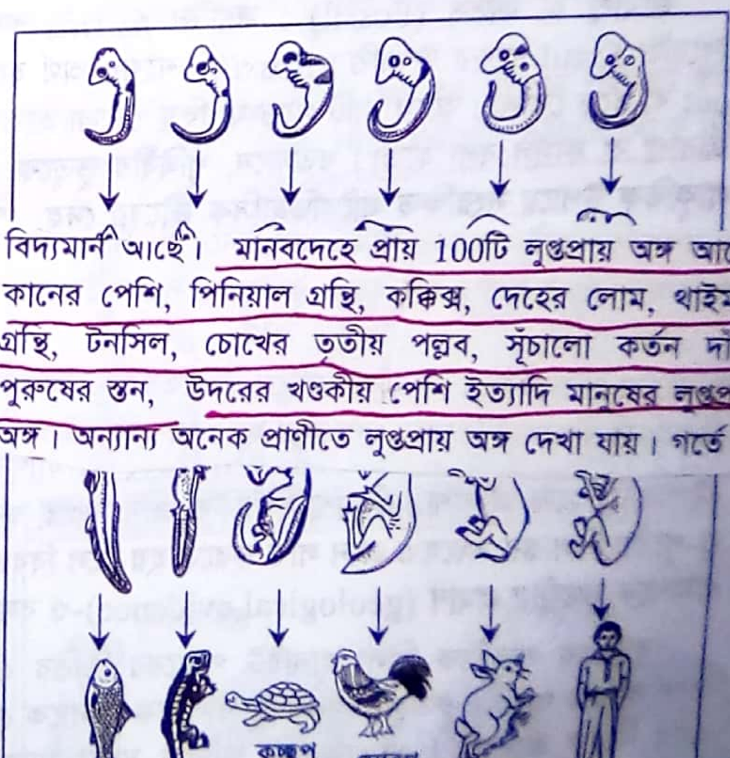

চিত্র ১১.২.৮ : বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ভ্রূণের সাদৃশ্য

২. ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ (Embryological Evidences)

ভ্রূণতত্ত্ব, তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব এবং পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্ব জৈব বিবর্তনের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে অনেকে মনে করেন। প্রতিটি বহুকোষী প্রাণী একটি জাইগোট (একটি একক কোষ) থেকে পরিস্ফুটিত হয়। জাইগোটের বিভাজন,

মানুষসহ সকল বহুকোষীতেই মূলত এক রকম। যে সব পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠনগত সম্বন্ধপরতায় আবদ্ধ তাদের পরিস্ফুটন পদ্ধতিও সদৃশ। পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিস্ফুটনরীতি বিভিন্ন রূপ নেয়। এ বিভিন্নতা অনেকটা গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মতো অগ্রসর হতে থাকে। মাছ, উভচর, সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণগুলোকে প্রথম অবস্থায় পরস্পর থেকে প্রায় পৃথকই করা যায় না। পরিস্ফুটনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক শ্রেণির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়।

ভ্রূণের এই সাদৃশ্য লক্ষ করে জার্মান বিজ্ঞানী **কার্ল ভন বেয়ার** (Karl von Baer, ১৮১৮) বলেছেন যে **ভ্রূণাবস্থায় একটি জীব আদি ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে থাকে**। তাঁর মতে– (i) বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবির্ভাবের আগে সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব ঘটে; (ii) সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে অবশেষে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত হয়; (iii) ভ্রূণাবস্থায় একটি প্রাণী তাড়াতাড়ি অন্যান্য প্রাণীর গঠন ত্যাগ করে; এবং (iv) একটি শিশু প্রাণীকে তার নিম্নস্তরের প্রাণিগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ দশার মতো নয় বরং শিশু বা ভ্রূণীয় দশার মতো দেখায়। অতএব বলা যায় যে, **সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়ে পরে বিভিন্নভাবে বিকশিত ও অভিযোজিত হয়েছে।**

পরবর্তীকালে **হেকেল** (Haeckel) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রাণীর জীবন-ইতিহাস এবং ভ্রূণের পরিস্ফুটন পর্যবেক্ষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে **পুনরাবৃত্তি মতবাদ** (Recapitulation Theory) নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী, **ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি করে** (Ontogeny Recapitulates Phylogeny); অর্থাৎ **কোন একটি জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালে তার পূর্বপুরুষের ক্রমবিকাশের ঘটনাবলি পুনরাবৃত্তি করে।**

৩. জীবাশ্মঘটিত বা ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ (Geological Evidences)

জীবাশ্ম বা **ফসিল** (Fossil) : ল্যাটিন *fossilis* শব্দ থেকে ইংরেজি fossil শব্দের উৎপত্তি। *Fossilis* শব্দের অর্থ হলো dug out বা খুঁড়ে তোলা। আগে মাটি খুঁড়ে যা কিছু তোলা হতো তাকেই জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হতো। বর্তমানে, **পৃথিবীর ভূত্বকে** (crust) **প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক জীবের দেহ, দেহাবশেষ বা দেহের কোন অংশের চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে**। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম আহরণ, বয়স ও বিবর্তনের ধরন নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় তাকে **প্যালিওন্টোলজী** (Palaeontology) বা **জীবাশ্মবিদ্যা বলে**।

বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্য (উপাদান) হচ্ছে জীবাশ্ম। জীবাশ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাস্তর সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করতে হয় বলে বিবর্তনের এই প্রমাণকে **ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ** (geological evidence)-ও বলা হয়।

ভূত্বকের পাললিক শিলা গ্রানাইট পাথরের ভিত্তির ওপর স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। ভূতত্ত্ববিদগণ এই পাললিক শিলাকে ৫টি প্রধান স্তরে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেক স্তর সৃষ্টিতে যতো সময় লেগেছে তাকে **মহাযুগ** (Era), প্রতিটি মহাযুগকে একাধিক **যুগ** (Period), প্রতিটি যুগকে আবার **ইপোক** (Epoch) বা **উপযুগ**- এ ভাগ করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম লেড পদ্ধতি ও তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতির মাধ্যমে ভূত্বকের শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন স্তরে পাওয়া একই প্রাণীর জীবাশ্মগুলো যদি বয়স অনুযায়ী সাজানো যায়

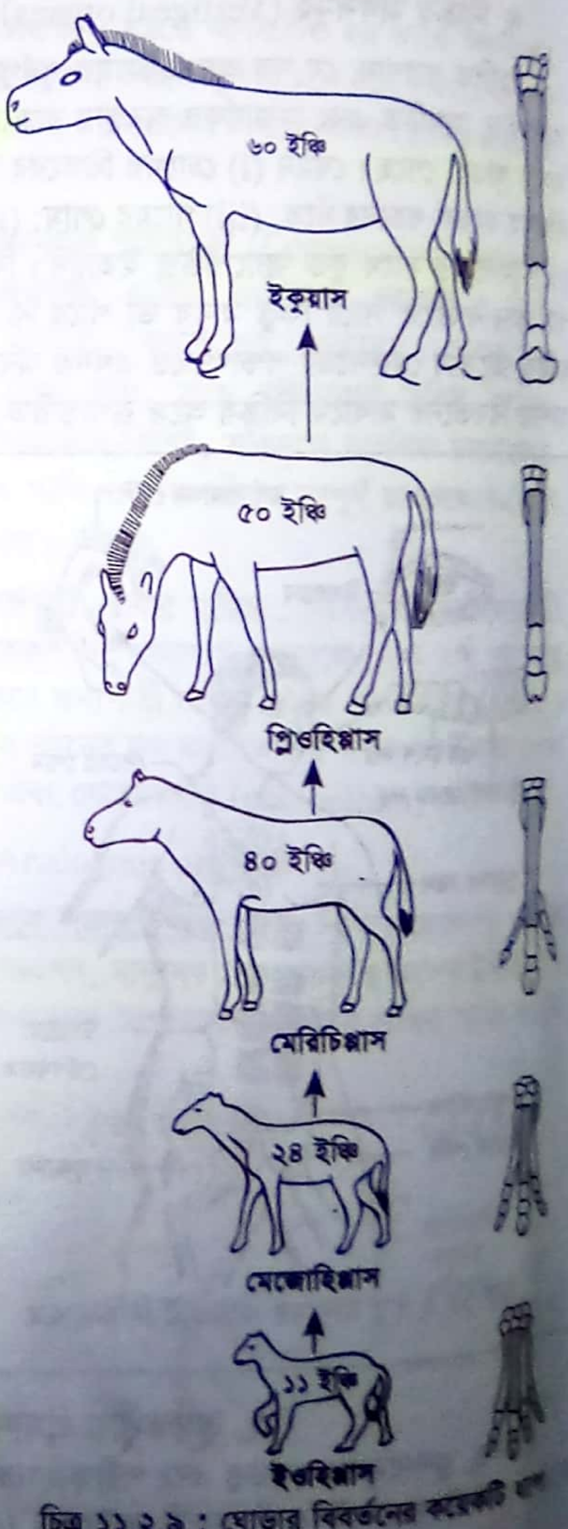

চিত্র ১১.২.৯ : ঘোড়ার বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ (Evidences of Evolution)

তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy)

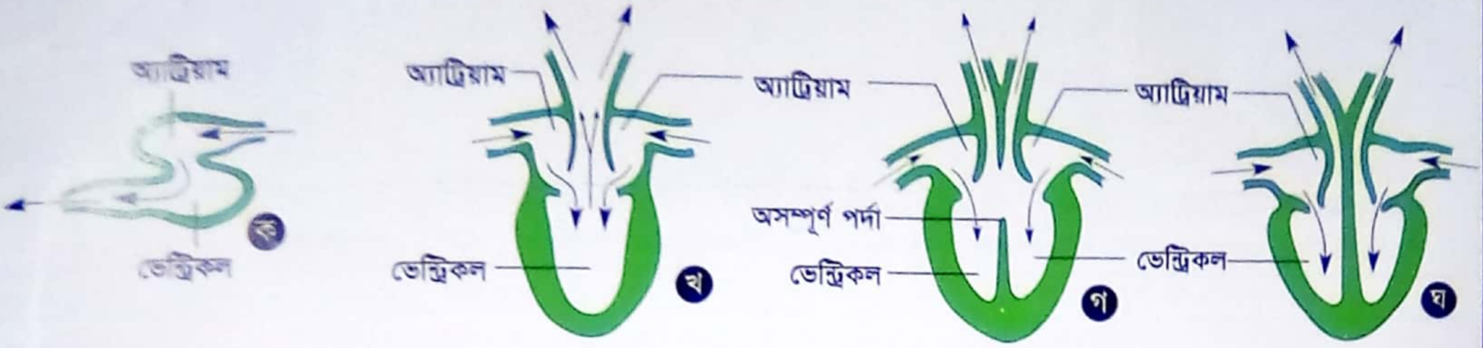

চিত্র ঃ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিন্ড। (ক) মাছে দুই-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; (খ) উভচরে তিন-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; (গ) সরিসৃপে অসম্পূর্ণ চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; (ঘ) স্তন্যপায়ীতে সম্পূর্ণ চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।

বিবর্তনের ধাপ

বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বিবর্তনের তিনটি ধাপ নির্ণয় করেছেন, যথা-

১। **মাইক্রো বিবর্তন** (Microevolutiom): জীবের জিন মিউটেশনের প্রভাবে যে বিবর্তন ঘটে তাকে মাইক্রো বিবর্তন বলে। এক্ষেত্রে কোনো প্রজাতির জীবগোষ্ঠীতে অল্পমাত্রায় পরিবর্তন সাধিত হয়ে বিভিন্ন জাত (race), ক্লাইন (cline) বা উপ-প্রজাতির (sub species) সৃষ্টি হয়।

২। **ম্যাক্রো বিবর্তন** (Macroevolution): মাইক্রো বিবর্তন উপ প্রজাতির ধাপ অতিক্রম করে প্রজাতি সৃষ্টির বিবর্তনকে ম্যাক্রো-বিবর্তন বলে।

৩। **মেগা বিবর্তন** (Megaevolution): ম্যাক্রো বিবর্তন ধাপ অতিক্রম করে গণ এর উপরের পর্যায়ের স্তরগুলো সৃষ্টি হলে তাকে মেগা বিবর্তন বলে। এ বিবর্তনের মাধ্যমে মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

অস্থিময় মাছ উভচর সরিসৃপ পাখি স্তন্যপায়ী

(১) অলফ্যাক্টরী লোব; (২) সেরেব্রাম; (৩) অপটিক লোব; (৪) সেরেবেলাম; (৫) মেডুলা; (৬) স্নায়ুরজ্জু

চিত্র ঃ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন

সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organs)

চিত্র ঃ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সমসংস্থ অঙ্গ

পুনরাবৃত্তি মতবাদ (Recapitulation Theory)

চিত্র ঃ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের সাদৃশ্য

মানবদেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (Vestigeal Organs)

জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ (Palaeontological Evidences)

- **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (Agglutinogens): এগুলো লোহিত রক্তকণিকার আবরণীতে বিদ্যমান অ্যান্টিজেন (antigen) পদার্থ যা জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে। মানুষের রক্তে প্রধান তিন ধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে, যথা- A, B ও Rh।
- **অ্যাগ্লুটিনিন** (Agglutinins): এগুলো রক্তের প্লাজমাতে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি (antibody)। অ্যাগ্লুটিনিন প্রাকৃতিক (IgM) ও অনাক্রম্য (IgG) ধরনের হয়ে থাকে।

দুটি বিশেষ রক্তগ্রুপে রক্ত সঞ্চারণের সময় অসঙ্গতি বিক্রিয়া ঘটে। এরা হলো- ABO ও Rh রক্তগ্রুপ। অন্যান্য রক্তগ্রুপের কয়েকটি হলো: MN রক্তগ্রুপ, কেলী রক্তগ্রুপ, ডাফি রক্তগ্রুপ, লুইস রক্তগ্রুপ ইত্যাদি।

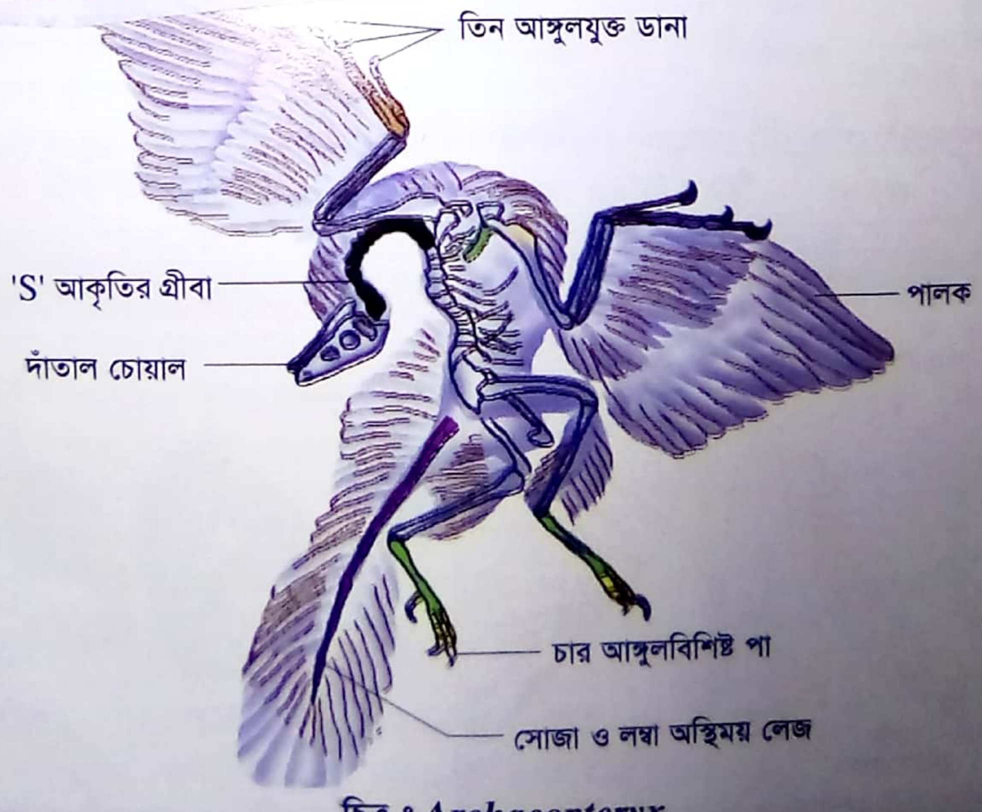

চিত্র : ***Archaeopteryx***

তাহলে সময়ের সঙ্গে ঐ প্রাণিগুলোর বিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে। বিভিন্ন শিলাস্তরে পাওয়া ঘোড়া, হাতি, উট ইত্যাদি প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে।

ক. ঘোড়ার বিবর্তনের ধারা : হাজার হাজার হাড় ও দাঁতের জীবাশ্ম থেকে ঘোড়ার বিবর্তনের যে কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক এবং নিঃসন্দেহে সেই একই বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করে যে "পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে হয়।" নিচে ঘোড়ার বিবর্তনের প্রধান ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. *Eohippus* (ইওহিপ্পাস) : ইওসিন উপযুগে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি বছর আগের *Eohippus* নামক ১১ ইঞ্চি উঁচু আকৃতির প্রাণীটিকে ঘোড়ার পূর্ব পুরুষ হিসেবে ধরা হয়। বিবর্তনবিজ্ঞানীদের ধারণা, পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণীর উত্তরসূরী, কিন্তু এর সামনের পায়ে ছিল ৪টি এবং পেছনের পায়ে ৩টি আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলো ছিল ক্ষুরাকৃতি ও নখরযুক্ত।

২. *Orohippus* (অরোহিপ্পাস) : ঘোড়ার এই পুরুষের পা ৫ম আঙ্গুলের অবশিষ্টাংশ বর্জিত, সামনের পায়ের মধ্য আঙ্গুলের বৃদ্ধি এবং পাশের আঙ্গুলের খর্বাকায় ধারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিও ইওসিন উপযুগের সদস্য।

৩. *Mesohippus* (মেজোহিপ্পাস) : ওলিগোসিন উপযুগে (সাড়ে ৪ কোটি বছর পূর্বে)- এ ঘোড়ার উচ্চতা হয় ২৪ ইঞ্চি। প্রত্যেকটি পা ৩টি সক্রিয় আঙ্গুলবিশিষ্ট।

৪. *Merychippus* (মেরিচিপ্পাস) : মায়োসিন উপযুগে (সাড়ে ৩ কোটি বছর পূর্বে) ঘোড়া দৃশ্যত ৩ আঙ্গুলবিশিষ্ট ও প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি আঙ্গুলই কার্যক্ষম ছিল।

৫. *Pliohippus* (প্লিওহিপ্পাস) : প্লিওসিন উপযুগের (২ কোটি বছর পূর্বে) ঘোড়ার পায়ে একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কোন আঙ্গুলের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এদের খুলি এবং দাঁতের বৈশিষ্ট্যও আধুনিক ঘোড়ার মতই ছিল।

৬. *Plesihippus* (প্লেসিহিপ্পাস) : *Pliohippus* - এর আরও একধাপ উন্নতি ঘটে এই জাতীয় ঘোড়ায় এবং এ থেকেই প্লিস্টোসিন উপযুগে (১০ লক্ষ বছর পূর্বে) আধুনিক ঘোড়া *Equus* (ইকুয়াস)- এর উৎপত্তি হয়েছে।

ইওহিপ্পাস→অরোহিপ্পাস→মেজোহিপ্পাস→মেরিচিপ্পাস→প্লিওহিপ্পাস→প্লেসিহিপ্পাস→ইকুয়াস (আধুনিক ঘোড়া)।

খ. সংযোগকারী যোগসূত্র (Connecting Link) : দুটি নিকটবর্তী পর্ব বা শ্রেণির মধ্যবর্তী দশার জীবাশ্মকে **সংযোগকারী যোগসূত্র** বলে। *Archaeopteryx* (আর্কিওপটেরিক্স) এ ধরনের একটি জীবাশ্ম। আদি পাখির নাম **আর্কিওপটেরিক্স** (*Archaeopteryx lithographica* যার অর্থ ancient wing inscribed in stone)। এদের কোন সদস্য বর্তমানে জীবিত নেই। আজ থেকে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে **জুরাসিক** যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল। এই পাখির ধ্বংসাবশেষ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত সোলেনহোপেন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়। মোট ১০টি জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় যার মধ্যে সর্বশেষটি আবিষ্কৃত হয়েছে ২০০৭ সালে। *Archaeopteryx*-এর মধ্যে **সরিসৃপ** ও **পাখি** উভয় শ্রেণির কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির জন্য একে **সংযোগকারী যোগসূত্র** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Archaeopteryx-**এ সরিসৃপীয় বৈশিষ্ট্য –**

১. দেহ সরিসৃপের মতো লম্বা এবং শুষ্ক **আঁইশ**যুক্ত।
২. দেহকঙ্কাল পুরু ও ভারী হাড় দিয়ে গঠিত।
৩. ডানার অগ্রভাগে **নখর** এবং চোয়ালে **দাঁত** বিদ্যমান।

Archaeopteryx-**এ পাখির বৈশিষ্ট্য–**

১. দেহের গঠন পাখির মতো এবং লেজ ও ডানায় পালক বিদ্যমান।
২. দেহে হাড়ের সংস্থাপন পাখির মতো।
৩. পাখির মতো **ডানা** উপস্থিত এবং ঠোঁট **চঞ্চু**তে পরিবর্তিত হয়েছে।

Archaeopteryx-এর জীবাশ্ম সরিসৃপ থেকে পাখিতে রূপান্তরিত হওয়ার অনেক প্রমাণ বহন করে। এ কারণে বলা হয় Birds are Glorified Reptile অর্থাৎ **পাখি একটি মহিমান্বিত সরিসৃপ**।

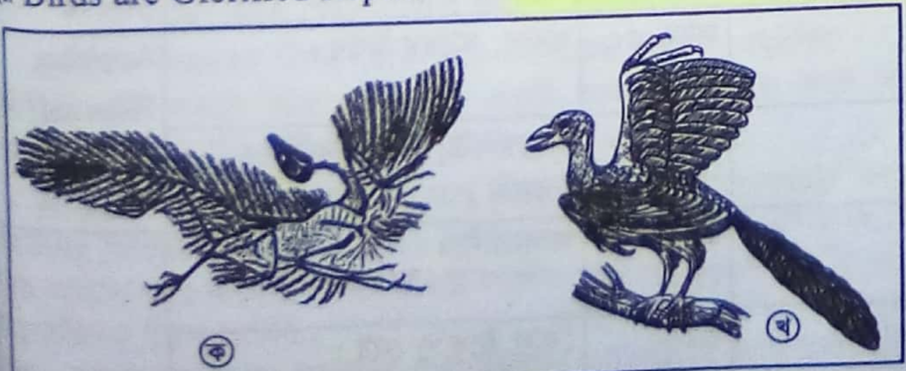

চিত্র ১১.২.১০ : *Archaeopteryx* : (ক) জীবাশ্ম ; (খ) জীবাশ্মটি পুনর্গঠন করলে যেমনটা দেখাত

চিত্র ১১.২.১১ : দুটি জীবন্ত জীবাশ্ম

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale)

মহাযুগ (Eras)	যুগ (Period)	উপযুগ (Epoch)	বছর পূর্বে	প্রধান প্রাণী (Dominant Animals)	মন্তব্য (Remarks)
		রিসেন্ট (Recent)	২৫ হাজার	আধুনিক মানুষ ও সভ্যতার উদ্ভব।	
	কোয়াটারনারি (Quaternary)	প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	১০ লক্ষ	মানুষের প্রথম সামাজিক জীবন; বহু স্তন্যপায়ী লুপ্ত।	
		প্লিওসিন (Pliocene)	২ কোটি	মানুষের উদ্ভব।	
সিনোজয়িক (Cenozoic)	টারশিয়ারি (Tertiary)	মায়োসিন (Miocene)	সাড়ে ৩ কোটি	স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য	
		ওলিগোসিন (Oligocene)	সাড়ে ৪ কোটি	নানা ধরনের স্তন্যপায়ী।	স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of Mammal)
		ইওসিন (Eocene)	সাড়ে ৬ কোটি	আদি স্তন্যপায়ী লুপ্ত; অমরায়ুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	সাড়ে ৭ কোটি	আদিম স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
	ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)		সাড়ে ১৩ কোটি	ডাইনোসরের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, বর্তমান পাখির উদ্ভব; আদি স্তন্যপায়ী।	
মেসোজয়িক (Mesozoic)	জুরাসিক (Jurassic)		সাড়ে ১৬ কোটি	বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর; দাঁতযুক্ত প্রথম পাখি।	সরিসৃপের যুগ (Age of Reptile)
	ট্রায়াসিক (Triassic)		সাড়ে ২২ কোটি	ডাইনোসরের উদ্ভব; স্তন্যপায়ী-সদৃশ সরিসৃপের প্রাধান্য।	
	পারমিয়ান (Permian)		২৪ কোটি	বর্তমান পতঙ্গ; বহু আদি প্রাণী লুপ্ত; স্থলে প্রাণীর আবির্ভাব।	
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		–	পতঙ্গ, কন্টকত্বক প্রাণী, হাঙ্গর, আদি সরিসৃপ।	
প্যালিওজয়িক (Paleozoic)	ডেভোনিয়ান (Devonian)		সাড়ে ৩৭ কোটি	বহু প্রজাতির মাছ; উভচরের আবির্ভাব।	উভচর, মাছ ও অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের যুগ (Age of Amphibia, Fishes and Inverte-brates)
	সিলুরিয়ান (Silurian)		সাড়ে ৪২ কোটি	কাঁকড়া, বিছা, মাছ।	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		সাড়ে ৫০ কোটি	প্রবাল; মাছের উদ্ভব।	
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		সাড়ে ৫৮ কোটি	অমেরুদণ্ডী; ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি।	
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			১৫০ কোটি	আদ্যপ্রাণী।	
আরকিওজয়িক (Archeozoic)			৩৫০ কোটি	কোন জীবাশ্ম নেই।	

গ. জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil) : যে সব প্রাণী সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে আজও অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজের অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় প্রায় সবাই বহু আগে বিলুপ্তি হয়েছে এবং যারা পর্ব থেকে পর্বের বা শ্রেণি থেকে শ্রেণির উদ্ভবের নিদর্শন বহন করে চলেছে সেগুলোকে **জীবন্ত জীবাশ্ম** বা **লিভিং ফসিল** বলে। *Platypus* (প্লাটিপাস) এ ধরনের একটি জীবন্ত জীবাশ্ম। এর কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন-ডিম, রেচন-জননতন্ত্র) সরিসৃপ শ্রেণির মতো, আবার কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন-স্তনগ্রন্থি, লোম) স্তন্যপায়ীর মতো। এ ছাড়া *Limulus, Peripatus, Sphenodon, Latimaria*-ও জীবন্ত জীবাশ্ম।

৪. শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিত প্রমাণ (Taxonomical Evidencences)

সমগ্র জীবজগতকে প্রধানত প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো আবার **পর্ব** (Phylum), **শ্রেণি** (Class), **বর্গ** (Order), **গণ** (Genus), **প্রজাতি** (Species) ইত্যাদি উপবিভাগে বিভক্ত। এ ভাগগুলো খেয়াল খুশীমত করা হয়নি। ভাগগুলো প্রকৃতই সম্পর্ক নির্ভর। একই রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণিদের একটি প্রজাতিভুক্ত করা হয়। একই ধরনের অনেক প্রজাতি মিলে একটি "গণ", কয়েকটি গণের সমষ্টি একটি "বর্গ", অনেক বর্গের সমষ্টি মিলে একটি "শ্রেণি" এবং কয়েকটি শ্রেণি মিলে "পর্ব" এবং কয়েকটি "পর্ব" একত্র করে প্রাণিদের ক্ষেত্রে "প্রাণিজগত" এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে "উদ্ভিদজগত" সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবর্তনবিজ্ঞানীদের ধারনা জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যসমূহের সমতার কারণ বৈশিষ্ট্যগুলো একই পূর্বপুরুষ থেকে বংশাধিকার সূত্রে পাওয়া।

৫. শারীরবৃত্তীয় ও জীবরসায়নঘটিত প্রমাণ (Physiological and Biochemical Evidences)

নিচুশ্রেণির প্রাণীর জৈবনিক প্রক্রিয়া উচু শ্রেণির প্রাণীর মত জটিল নয়। তথাপিও একই শ্রেণির প্রাণিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে একই ধরনের। এদের খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, রেচন, শ্বসন প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জীব রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের একই ধরনের কতকগুলো জৈবিক উপাদান বিদ্যমান। যেমন-আমিষ, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি। এসব উপাদানগুলোর আণবিক গঠনগত মিলগুলোও লক্ষণীয়। আদিতম জীব থেকে জাটিলতম জীবে এসব উপাদানের উপস্থিতিই বিতর্তনের প্রমাণ বহন করে।

৬. কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Cytological Evidences)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের মৌলিক গঠন ও বিভাজন পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আণবিক পর্যায়ে সজীব কোষ-অঙ্গাণুগুলো, যেমন-মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম, লাইসোজোম, গলজিবস্তু, ক্রোমোজোম প্রভৃতির গঠন প্রায় একই। তাই বলা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

৭. জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Genetical Evidences)

বিভিন্ন জীবের মধ্যে সমতা ও বৈষম্যের কারণ যে **জিনগত গড়ন** (genetic consitution) তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। জিনগত এ বৈশিষ্ট্যই বিবর্তনের ভিত্তি এবং কীভাবে এটি পরিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তাও বিজ্ঞানীদের কাছে আর অজ্ঞানা নয়। *Drosophila* (ড্রসোফিলা)-র বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজোমগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাদের পূর্বপুরুষ নির্ধারণ করা যায় এবং এ সত্যই প্রকাশিত হয় যে ওরা একই পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছে।

৮. জীব ভৌগোলিক প্রমাণ (Evidence from Geographical Distribution)

প্রাণিদের বিস্তারের উপর ভিত্তি করে **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস** (Alfred Russel Wallace) ১৮৭০ সালে পৃথিবীকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। একটি অঞ্চলের জীবের সাথে অন্যটির সাদৃস্য খুব কমই। জীবের এমন ভৌগোলিক বিস্তার অভিব্যক্তিরই ধারা নির্দেশ করে।

একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রাপ্ত **মারসুপিয়াল** (marsupial) স্তন্যপায়ীদের উপস্থিতি ও অতীত বিস্তারকে বিবর্তনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। ভূত্তাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়া অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে এমন এক সময় আলাদা হয়ে গিয়েছিল যখন মারসুপিয়ালরা পৃথিবীর অনেকাংশে বিস্তৃত ছিল এবং তখনও **অমরাধর** (placental) স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব ঘটেনি। সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় সম্ভবত গুটিকয়েক ধরনের আদি স্তন্যপায়ী বাস করত। মূল ভূখণ্ডে তখন অমরাধর স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবের ফলে আদি প্রাণীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অমরাধর প্রাণী অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না পারায় মারসুপিয়ালরা বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে পরিবেশের প্রতিটি অংশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে।